উপমহাদেশের সমাজ-জীবনে প্রতিনিয়ত অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসা মুসলিম-হিন্দু দুটি জাতির মাঝে উদ্বেগ, অবিশ্বাস এবং সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। কারা যেন মুসলিম উম্মাহর প্রতি সাধারণ হিন্দুদের মাঝে বিদ্বেষের ভয়াবহ আগুন প্রজ্বলিত করছে। গভীর অনুসন্ধানের পর দেখা গিয়েছে যে, হিন্দু সমাজের বিশাল একটি অংশ নতুন এক আদর্শ গ্রহণ করছে, যা তাদেরকে কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী দানব গোষ্ঠীতে পরিণত করছে। উপমহাদেশের সেমেটিক ধর্ম সমূহ, প্রধানত মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতাই হল এই আদর্শের মূল উপাদান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-

- সেই ধ্বংসাত্মক আদর্শের পরিচয় কী, যার কারণে উপমহাদেশের জমিন প্রতিনিয়ত মুসলিমদের জন্য সংকীর্ণ হচ্ছে?

- কেন হিন্দুদের একটি বিশাল অংশ মুসলিম জাতির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতা নিয়ে বড় হচ্ছে?

- কেন তারা মুসলিমদের উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়; তাঁদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে চায়?

- কেন তারা মুসলিমদের মসজিদ-মাদরাসা এবং খ্রিস্টানদের গির্জা গুড়িয়ে দিচ্ছে?

- 'অখণ্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার এই গভীর ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে কারা; তারা কী চায়?

সম্মানিত পাঠক! এই বইটি আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব দিবে- একটু উলটে দেখুন

বৈচিত্র্য প্রকাশ
01615748115

cover : rhine / 01627223203

উস্তাদ নুমান আব্দুল্লাহ হিজাজি

হিন্দুত্ববাদ

উপমহাদেশে মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ উপাখ্যান

ওঁ

আবু খাদিজা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
অনূদিত

বৈচিত্র্য

হিন্দুত্ববাদ

উপমহাদেশে মুসলিম বিরোধী
ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ উপাখ্যান

মূল
উস্তাদ নুমান আব্দুল্লাহ হিজাজি

অনুবাদ
আবু খাদিজা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

বৈচিত্র্য
প্র কা শ

বৈচিত্র্য
প্র কা শ
কওমি মার্কেট (২য় তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৬১৫-৭৪৮১১৫
Facebook.com/Nasiha publication
nasihapub@gmail.com

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪

প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজহার
পৃষ্ঠাসজ্জা: রিদওয়ানুল্লাহ তানিম
পরিবেশক: প্রয়াস প্রকাশন
০১৬১৫-২৩৩২৬১

মুদ্রিত মূল্য: ২৮০ টাকা

অর্পণ—

জঙ্গি সংগঠন ইসকনের হাতে শাহাদাত বরণকারী চট্টগ্রামের আইনজীবী শহীদ সাইফুল ইসলাম আলিফ রহ.—কে।

আল্লাহ আপনাকে জান্নাতের সবুজপাখি হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

আমার কিছু কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের কলিজার টুকরো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। বান্দার অনূদিত বই 'হিন্দুত্ববাদ - উপমহাদেশে মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ উপাখ্যান' এর কাজ শেষ হয়েছে। হয়তো অচিরেই পাঠকদের হাতে যাবে ইনশা আল্লাহ। লাকাল হামদু ওয়ালাকাশ শুকরু ইয়া আল্লাহ।

দায়বদ্ধতার কারণে বইটি পাঠের পূর্বে অল্প কিছু কথা পাঠকদের কাছে পেশ করা অতীব জরুরি মনে করছি। আশা করছি এই ভূমিকা পাঠকদের বইটি পড়তে সাহায্য করবে ইনশা আল্লাহ।

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা! বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উপমহাদেশের সমাজ-জীবনে প্রতিনিয়ত অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসা মুসলিম-হিন্দু দুটি জাতির মাঝে উদ্বেগ, অবিশ্বাস এবং সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। কারা যেন মুসলিম উম্মাহর প্রতি সাধারণ হিন্দুদের মাঝে বিদ্বেষের ভয়াবহ আগুন প্রজ্বলিত করছে। গভীর অনুসন্ধানের পর দেখা গিয়েছে যে, হিন্দু সমাজের বিশাল একটি অংশ নতুন এক আদর্শ গ্রহণ করছে, যা তাদেরকে কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী দানব গোষ্ঠীতে পরিণত করছে। উপমহাদেশের সেমেটিক ধর্ম সমূহ, প্রধানত মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতাই হল এই আদর্শের মূল উপাদান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-

- সেই ধ্বংসাত্মক আদর্শের পরিচয় কী, যার কারণে উপমহাদেশের জমিন প্রতিনিয়ত মুসলিমদের জন্য সংকীর্ণ হচ্ছে?

- কেন হিন্দুদের একটি বিশাল অংশ মুসলিম জাতির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতা নিয়ে বড় হচ্ছে?

- কেন তারা মুসলিমদের উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়; তাঁদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে চায়?

- কেন তারা মুসলিমদের মসজিদ-মাদরাসা এবং খ্রিস্টানদের গির্জা গুড়িয়ে দিচ্ছে?

- 'অখণ্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার এই গভীর ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে কারা; তারা কী চায়?

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা! এই বইটি আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব দিবে- একটু উল্টে দেখুন ইনশা আল্লাহ!

ভূমিকার শেষ-পর্যায়ে এসে বান্দা বইটির পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে সবিনয় বিনীত অনুরোধ করছি—

- ✓ বইটি পড়ে যদি আপনি উপকৃত হন, তাহলে আপনার দুয়ায় আমাকে, আমার পরিবারকে ও সকল মুসলিমকে শরিক রাখবেন!
- ✓ বইটি পড়ে যদি আপনি উপকৃত হন, তাহলে হিন্দুত্ববাদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে নিজে সতর্ক হবেন ও জাতিকেও সতর্ক করবেন!
- ✓ বইটি পড়ে যদি আপনি উপকৃত হন, তাহলে হিন্দুত্ববাদের বিস্তৃত ফিতনা থেকে নিজেকে ও পুরো জাতিকে রক্ষায় সচেষ্ট হবেন!
- ✓ বইটি যদি আপনি উপকারী মনে করেন, তাহলে বইটির প্রচার-প্রসারে সাধ্যানুযায়ী অবদান রাখবেন!

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা! বইটিকে সর্বাত্মক ভুল-মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। তবে আমার অযোগ্যতা ও ইলমি দুর্বলতার ব্যাপারে আমি ভালো করেই জানি। তাই এই বইতে ভালো যা কিছু আছে, সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে ও আমার ভুল। আমি আল্লাহর কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাই। আল্লাহ বইটিকে কবুল করে নিন! আল্লাহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করে নিন। তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমিন।

বিনীত

আবু খাদিজা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

সোমবার, রাত ১১:০০ মিনিট

১ জুমাদাল উখরা, ১৪৪৬ হিজরী

১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২ ডিসেম্বর, ২০২৪

সূচী

লেখকের ভূমিকা

একসময় যুদ্ধ কেবল যুদ্ধক্ষেত্র এবং অস্ত্রের মাধ্যমে লড়া হত। কিন্তু এই আধুনিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার কারণে যুদ্ধের ক্ষেত্র এবং ফ্রন্টলাইন অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। এখন যুদ্ধ কেবল সামরিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, মিডিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনেক ফ্রন্টে লড়াই হয়। এর মধ্যে সম্ভবত বর্তমানে শত্রুর জন্য সবচেয়ে কার্যকর ফ্রন্ট হলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়ার ক্ষেত্র।

এই যুদ্ধ শিক্ষা ও গণমাধ্যমের ময়দানে পরিচালিত হয়। এর অস্ত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হলো বিভিন্ন পরিভাষা। যখন বিরোধীদের গুণাবলীকে দোষ হিসেবে প্রদর্শন করতে হয়, তখন নেতিবাচক পরিভাষার উদ্ভব হয়। যেমন: সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ, চরমপন্থা, মৌলবাদ ইত্যাদি। আবার নিজেদের দোষগুলোকে গুণ হিসেবে তুলে ধরার জন্য ইতিবাচক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়, যেমন: গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা, বৈচিত্র্য ইত্যাদি।

এটি এমন একটি কার্যকর অস্ত্র, যার মাধ্যমে শত্রুর কৌশলকে অনুধাবন করা সত্ত্বেও কেউ এর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে না। শত্রু মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা হিসেবে দেখিয়ে দেয়, ভালোকে খারাপ আর খারাপকে ভালো বানিয়ে তোলে, সুবিধাকে অসুবিধা এবং অসুবিধাকে সুবিধা হিসেবে তুলে ধরে। তবুও, এই সবকিছুর মধ্যেও এই পরিভাষাগুলোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব চেতনার অদৃশ্য কোণে কিছু না কিছু জায়গা করে নেয়।

আজকের "গাজওয়াতুল হিন্দ" সম্পর্কেও এই পরিভাষাগুলো সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পরিভাষাগুলোর একটি হলো "হিন্দুত্ববাদ"। যদিও এই পরিভাষা মুসলমানদের উপর কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলেনি, তবে সম্ভবত মুসলমানদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলার উদ্দেশ্য ছিলও না। বরং এই ইতিবাচক প্রভাব হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যই প্রাসঙ্গিক ছিল, যাতে এই পরিভাষাকে ভিত্তি করে জাতপাত এবং অসংখ্য শ্রেণিতে বিভক্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। এছাড়াও, কিছু মিষ্টি ব্যাখ্যা বিশ্বের জন্যও প্রস্তুত রাখা হয়েছে,

যাতে কেউ এই পরিভাষার উপর আপত্তি করলে তার সামনে এই ব্যাখাগুলো উপস্থাপন করা যায়। মূলত, এটিকে একটি খুবই নরম, নম্র, সহনশীল এবং দয়ার ভাবধারা বলেই তুলে ধরা হয়।

ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের প্রায়শই এই পরিভাষার সম্মুখীন হতে হয়। তবে এটি সমগ্র উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য সাধারণভাবে এবং বিশেষত গাজওয়াতুল হিন্দের সাথে যুক্ত মুজাহিদদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা এই পরিভাষা, এর ভাবগত ভিত্তি, এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পরিভাষা, সেই সঙ্গে এসবের তাত্ত্বিক প্রবক্তাদের চিন্তাধারা এবং এগুলো গ্রহণকারী সংগঠনগুলোর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিকে ভালোভাবে বুঝতে পারেন। কারণ সামরিক ক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত করতে হলে, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রেও তাদের অস্ত্রের মোকাবিলা করতে সক্ষম হতে হবে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই রচনা লিখিত হয়েছে। আমরা আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ করে দিন এবং তাঁর দরবারে তা গ্রহণ করুন। আমিন।

প্রথম অধ্যায়

পরিচিতি ও পরিভাষা

পরিচিতি ও পরিভাষা

"হিন্দু জাতীয়তাবাদ" একটি মতবাদ। এই মতবাদটি ১৯২৩ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকার রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে প্রবর্তন করেছিলেন। পরবর্তীতে সংঘ পরিবারের[১] সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠন এই মতবাদকে সমর্থন করে এবং এর প্রচারে নেতৃত্ব দেয়।

হিন্দুত্ববাদ শব্দটি প্রথমে বাংলা সাহিত্যিক ও লেখক উপেন্দ্রনাথ হাওসু উনবিংশ শতকে ব্যবহার করেছিলেন এবং পরে বাল গঙ্গাধর তিলক এটি ব্যবহার করেন। তবে ওই সময় এই শব্দটি কেবল ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সংস্কৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এর বিপরীতে সাভারকর এই শব্দটিকে একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন:

> "সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হলো হিন্দুপন, অর্থাৎ কে কতটা হিন্দু। এবং যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই মতবাদে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তা বিবেচনা করা হলে এর অর্থ হতে পারে - কে কতটা হিন্দুস্তানি।"

সাভারকার "হিন্দুত্ববাদ" সম্পর্কে মন্তব্য করে লেখেছে:

> "হিন্দুত্ববাদ শুধু একটি শব্দ নয়, এটি একটি ইতিহাস। এটি শুধুমাত্র আমাদের মানুষের আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস নয়, যেমনটি কখনও কখনও ভুলভাবে বোঝা হয়। এবং এটি ও হিন্দুধর্মকে একই জিনিসের দুটি নাম মনে করা হয়, বরং এটি একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস। হিন্দুধর্ম মূলত হিন্দুত্ববাদ থেকে উদ্ভূত- এটি তার একটি অংশ, তার একটি খণ্ড। 'হিন্দুত্ববাদ' হিন্দু জাতির চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের সব ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।"

[১] ওই সমস্ত সংগঠন, যেগুলো হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন আরএসএস-এর সহযোগী সংগঠন বা সমর্থনকারী সংগঠন হিসেবে পরিচিত, তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে "সংঘ পরিবার" বলা হয়। বিজেপিও সংঘ পরিবারের একটি অংশ। বজরং দল, মহাসংঘ, শিবসেনা, আকালি দল এবং এজাতীয় আরও কয়েকটি সংগঠন যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘ পরিবারের অংশ নয়, তবুও যেহেতু হিন্দুত্ববাদই তাদের মৌলিক মতাদর্শ এবং সংঘ পরিবার মূলত হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের প্রচারক গোষ্ঠী, তাই এই সংগঠনগুলোকেও সংঘ পরিবারের সাথে সম্পর্কিত বলে বিবেচনা করা হয়।

সাভারকারের মতে হিন্দুত্ববাদের তিনটি ভিত্তি রয়েছে:

এক. রাষ্ট্র (সমন্বিত সমাজ)

দুই. জাতি (সমন্বিত জাতি-গোষ্ঠী)

তিন. সংস্কৃতি (সমন্বিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

এই তিনটি ভিত্তিকে সামনে রেখে সাভারকার "হিন্দু" শব্দের একটি নতুন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, যা হিন্দুত্ববাদের ধারণার ভিত্তি তৈরি করে। সাভারকারের মতে:

> "হিন্দু" বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার জন্য সিন্ধু নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষের ভূমি কেবলমাত্র তার পিতৃভূমি নয়, একইসঙ্গে তার পবিত্র ভূমি। অর্থাৎ, সেই ভূমি যেখানে তার ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে।"[২]

হিন্দুত্ববাদী মতবাদ অনুসারে, স্থানীয় ধর্মগুলো যেমন হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং শিখধর্ম জাতীয়, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক মিল রয়েছে। এ কারণে তারা জাতি, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রের দিক থেকেও একত্রিত। এদের সবাইকে "হিন্দু" বা ভারতীয় গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তবে, সেমেটিক ধর্মগুলো বা আব্রাহামিক ধর্মগুলো (ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম) বাইরের দেশ থেকে এসেছে, এদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ভিন্ন, এবং এই ভূখণ্ড তাদের ধর্মের জন্মভূমি নয়। সেজন্য এগুলোকে ভারতীয় ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

এইভাবে এই তত্ত্বের অনুসারীরা ভারতের নাগরিকদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন:

এক. সবচেয়ে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুস্তানি হলো সেই ব্যক্তি, যিনি হিন্দু ধর্মের অনুসারী।

দুই. দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতীয় হলো সেই ব্যক্তি, যিনি হিন্দুধর্মের পরিবর্তে অন্যান্য স্থানীয় ধর্ম যেমন জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিখ ধর্ম ইত্যাদির অনুসারী।

তিন. যে ব্যক্তি ইসলাম, খ্রিস্টান বা অন্যান্য বহিরাগত ধর্মের অনুসারী, সে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না এবং তাকে ভারতীয় বলা উচিত নয়।

হিন্দুত্ববাদের চিন্তাবিদদের মতে, যারা সেমিটিক ধর্মাবলম্বী এবং যাদের জাতি ও রাষ্ট্র ভারতীয়, তারা যদি দুটি শর্ত পূর্ণ করেন, তবে তাদের প্রকৃত ভারতীয় বলা যেতে পারে:

[২] হিন্দুত্বভা (Hindutva) - ভি. ডি. সাভারকর

এক. তারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ ভারতীয় রীতিনীতি, প্রথা ও উৎসবগুলোকে গ্রহণ করবেন এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে ফেলবেন।

দুই. এই ভূমিকে তাদের পবিত্র স্থানগুলোর চেয়ে বেশি পবিত্র বলে মনে করবেন।

উদ্দেশ্যসমূহ

এই তত্ত্বটি উপস্থাপন করার মূল উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল যে, হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে জাতি ও শ্রেণীতে ব্যাপকভাবে বিভক্ত, ফলে তাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব রয়েছে, যার ফলে অন্যান্য ধর্ম ও জাতি তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাদের শাসন করে। সুতরাং, একটি সাধারণ পরিচয় প্রদান করবে, যা একদিকে হিন্দু ঐক্য (হিন্দু সংগঠন) প্রচার করবে এবং একই সাথে একটি এমন পরিচয় তৈরি করবে ,যার মাধ্যমে "হিন্দু" শব্দ শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে সীমাবদ্ধ না থেকে, ভারতের অন্যান্য স্থানীয় ধর্মসমূহ, যেমন বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং শিখধর্ম প্রভৃতি, তাদেরও হিন্দু বলা হবে। বরং এক্ষেত্রে আরও এগিয়ে গিয়ে এই স্থানীয় ধর্মগুলোকে হিন্দু ধর্মের অংশ হিসেবেও পরিচিত করা হবে, যাতে তারা বিদেশি ধর্ম এবং জাতির তুলনায় বেশি রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠতা অর্জন করতে এবং তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

লক্ষ্যসমূহ:

হিন্দুত্ববাদের নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক লক্ষ্য রয়েছে:

এক. হিন্দুদের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়, শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী করা হবে।

দুই. হিন্দু পরিচয়ের ক্ষেত্রে পুরো উপমহাদেশে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে এবং এমন পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যা এই পরিচয়টিকে আরও দৃঢ় করে তুলবে।

তিন. এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যার মাধ্যমে সেই সকল ব্যক্তিদের পুরনো ধর্মে ফিরে আসবে, যারা বহিরাগত ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দুত্ববাদের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক নির্মাতা

হিন্দুত্ববাদের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক নির্মাতা

যেকোনো তত্ত্ব তার তত্ত্ব-নির্মাতাদের চিন্তা-ধারার প্রতিফলন। এবং এই তত্ত্ব-নির্মাতাদের চিন্তা-ধারার উপর তাদের পটভূমির গভীর প্রভাব থাকে। হিন্দুত্ববাদের বর্তমান রাজনৈতিক তত্ত্ব বিভিন্ন যুগ এবং ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব থেকে প্রভাবিত হয়ে ধীরে ধীরে এই আকারে পৌঁছেছে। তাই, হিন্দুত্ববাদের তত্ত্ব এবং এর ভিত্তি বোঝার জন্য তার তত্ত্ব-নির্মাতাদের পটভূমি এবং তাদের চিন্তা-ধারা সম্পর্কে গভীরভাবে দেখাও জরুরি। নিচে হিন্দুত্ববাদের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব-নির্মাতা এবং তাদের চিন্তা-ধারার পরিচয় দেয়া হলো-

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিনায়ক দামোদর সাভারকর (Vinayak Damodar Savarkar)

হিন্দুত্ববাদ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দুত্ববাদী (সংঘ পরিবারের) সমস্ত সংগঠন তাকে নিজেদের সবচে' বড় গুরু হিসেবে মান্য করে। ভারতীয় উপমহাদেশে সাভারকরকে 'বীর' (হিরো) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সাভারকর ২৮ মে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের ভগর গ্রামে একটি মারাঠি চিতপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে[৩] জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তার মধ্যে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ছিল এবং তিনি আত্মকথায় এটি উল্লেখও করেছেন। তার মতে, ১২ বছর বয়সে তিনি নিজ গ্রামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি দাঙ্গার নেতৃত্ব দেন এবং সেখানে একটি মসজিদে হামলা করেন। এই হামলা নিয়ে তিনি লেখেন:

"আমরা মসজিদটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছি।"

ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই সাভারকর হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লন্ডনে শিক্ষা অর্জনকালে তাঁর বাসস্থান ছিল "ইন্ডিয়া হাউস"-এ, যা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের অন্যতম ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। এখানে থাকাকালে তিনি 'অভিনব ভারত সোসাইটি' এবং 'ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি' মতো হিন্দু ছাত্র সংগঠন গঠন করেন।

[৩] মহারাষ্ট্রের উপকূলীয় পল্লি কঙ্কনে বসবাসকারী কঙ্কনি ভাষার চিতপাবনি ধারায় কথা বলেন এমন একটি ব্রাহ্মণ পরিবার।

এই সময়ে তিনি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে "দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেনডেন্স" (The Indian War of Independence) নামে একটি বই লিখেছিলেন।

১৯১০ সালে সাভারকরকে ব্রিটেন ইন্ডিয়া হাউস -এর বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং মহারাষ্ট্রে তার ভাই মণীশ সাভারকর কর্তৃক শুরু হওয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী হওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। কারাগারে স্থানান্তরের সময় সে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এর ফলে তার বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং ১৯১১ সালে তাকে পঞ্চাশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং কালাপানিতে স্থানান্তরিত করা হয়।

সে কালাপানির কষ্ট সহ্য করতে পারেনি এবং সেখানে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রথম মাস শেষ হওয়ার আগেই সে দয়া করে শাস্তি মওকুফের একটি আপিল দাখিল করেছিল। তবে তা খারিজ করা হয়।

১৯১৩ সালে, সে আবার করুণা চেয়ে আবেদন করেছিল। এতে সে তার কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং মুক্তির পর অন্যান্য বিপদগামী ভারতীয়দের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার কাজ করবে। এবং ব্রিটিশ সরকার তাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাইবে, তাতে সে আনন্দের সঙ্গে রাজি থাকবে। কিন্তু এই আবেদনও খারিজ করা হয়।

১৯১৭ সালে তিনি আবার দয়া চেয়ে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি।

১৯২০ সালে তিনি চতুর্থবার দয়া চেয়ে আবেদন ব্রিটিশ সরকারের কাছে জমা দেন এবং ১৯১৩ সালে করা আবেদনটি পুনরায় উপস্থাপন করেন।

১৯২০ সালে কংগ্রেস নেতা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং বাল গঙ্গাধর তিলক-সাভারকরের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করেন। সাভারকর তার মুক্তির বদলে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, যাতে তার বিরুদ্ধে করা আদালতীয় ব্যবস্থা, প্রদত্ত দণ্ড এবং ব্রিটিশ আইনের পূর্ণ সমর্থন করেন এবং সহিংসতার বিরোধিতা করেন।

১৯২১ সালে সাভারকরকে রত্নগড়ী কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এই কারাগারে তিনি "হিন্দুত্ববাদ" সম্পর্কিত তাঁর বইটি লিখেছিলেন, যা হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হয়ে ওঠে। ১৯২৪ সালে কিছু শর্তসাপেক্ষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর উপর শর্ত ছিল যে, পরবর্তী পাঁচ বছর তিনি রত্নগড়ী জেলার বাইরে যাবেন না এবং কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবেন না।

সাভারকরের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই নিষেধাজ্ঞার পারবতে মাসিক ১০০০ রুপি দাবি করা হয়েছিল, যার জবাবে ব্রিটিশ সরকার ষাট রুপি মাসিক পরিমাণে রাজি হয়ে যায়। এর পর রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে, তারপর সেগুলো তুলে নেওয়া হয়। মুক্তির পর তিনি ব্রিটিশ রাজের বিরোধিতা ছেড়ে দেন এবং তাঁর পুরো মনোযোগ হিন্দু জাতীয়তাবাদে নিবদ্ধ করেন। কারাগারে যাওয়ার আগে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারত স্বাধীন করার কথা বলতেন, কিন্তু মুক্তির পর তিনি মুসলমান ও খ্রিস্টানদের থেকে হিন্দুদের স্বাধীনতার কথা বলতে শুরু করেন।

১৯২৪ সালে মুক্তি পাওয়ার পর "সাভারকরার" একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বা খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা। এই সংগঠনের লক্ষ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই সব মানুষদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে পরিণত করা, যারা মুসলিম বা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো রত্নগরির ঢরকা ব্রাহ্মণ পরিবারের আট সদস্য, যারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সাভারকরের একটি জনসভায় সেই পরিবারের সদস্যদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল এবং সেই পরিবারের দুটি মেয়ের বিয়ের খরচ বহন করার দায়িত্বও গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯৩৭ সালে যখন সাভারকরের রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়, তখন তিনি মুম্বাই স্থানান্তরিত হয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল 'হিন্দু মহাসভা'র সভাপতি নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি স্লোগান দেন, "সকল রাজনীতি হিন্দুদের অধীনে নিয়ে আসো এবং সকল হিন্দুকে যোদ্ধা বানাও"। এই উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য নিয়োগ প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থন জানান, যাতে হিন্দুরা সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে। যখন কংগ্রেস ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' শুরু করে, তখন সাভারকর এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানান যে, তারা যুদ্ধের সেবা অব্যাহত রাখুক এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করুক। পাশাপাশি, তিনি হিন্দুদের আরও উৎসাহিত করেন, যাতে তারা যুদ্ধের জন্য বেশি বেশি মানুষকে নাম লেখানোর জন্য প্ররোচিত করেন, যাতে আরও বেশি হিন্দু যুদ্ধ কৌশল শিখতে পারে।

জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে গান্ধীর হত্যার পর পুলিশ গান্ধীর খুনী নাথুরাম গডসে'কে গ্রেপ্তার করে। গডসে হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস কর্মী ছিল এবং সাভারকরকে তার গুরু মনে করত। ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮-এ সাভারকরকেও গান্ধীর হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।[4]

হত্যাকাণ্ডে জড়িত আরেক অভিযুক্ত "আপতে- এর সাক্ষ্য মতে, গান্ধীর হত্যা করার আগে গডসে তার গুরু সাভারকরের শেষ দর্শন করতে গিয়েছিল। আপতেও তার সঙ্গে ছিলেন। সাভারকর তাকে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'সফল হয়ে ফিরে এসো।' কিন্তু আদালত প্রমাণের অভাবে সাভারকরকে মুক্তি দেয়। নাথুরাম গডসেকে গান্ধীর হত্যার অপরাধে ১৯৪৯ সালে ফাঁসি দেওয়া হয়।

গান্ধীর হত্যার পর ক্ষুব্ধ জনতা সাভারকারের বাড়িতে পাথর ছোড়ে। গান্ধী হত্যা মামলায় মুক্তি পাওয়ার পর সাভারকর তাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বক্তৃতা দেওয়ার কারণে আবার গ্রেপ্তার করে। পরে তাকে এই শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় যে তিনি রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে দূরে থাকবেন। এরপর যদিও তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেন, তবে তার লেখনীর মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচার চালিয়ে যান।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ সালে সাভারকার খাওয়া-দাওয়া এবং ওষুধ গ্রহণ বন্ধ করে দিলেন এবং এটিকে "আত্মার্পণ"[5] (মৃত্যু পর্যন্ত উপবাস) নামে আখ্যায়িত করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি লেখা "আত্মাহত্যা নেহি আত্মার্পণ" রচনা করেন, যেখানে তিনি লিখেছিলেন:

> "যখন জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায় এবং সমাজের সেবা করার শক্তি আর অবশিষ্ট থাকে না, তখন অপেক্ষা করে মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে নিজের ইচ্ছায় জীবন শেষ করে দেওয়া ভালো।"

এইভাবে, ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ সালে সাভারকারের মৃত্যু হয়।

[4] এটি অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভা গডসের এই কর্মকাণ্ড থেকে বহুবার দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলে এসেছে। তবে, ২০১৩ সালে যখন নরেন্দ্র মোদির সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন হিন্দু মহাসভা সরকারকে দাবি জানায় যে, নাথুরাম গডসেকে জাতীয় নায়কের মর্যাদা দেওয়া হোক এবং তার একটি মূর্তিও স্থাপন করা হোক। ২০১৫ সালের ৩০ জানুয়ারি, গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে হিন্দু মহাসভা একটি প্রামাণ্যচিত্র "দেশভক্ত নাথুরাম গডসে" প্রকাশ করে। বর্তমানে হিন্দু মহাসভা চেষ্টারত আছে যে, নাথুরাম গডসের নামে একটি মন্দির নির্মাণ করা হবে এবং ৩০ জানুয়ারি গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীর পরিবর্তে "শৌর্য দিবস" (বীরত্বের দিন) উদযাপন করা হবে।

[5] আত্মহত্যা নয়, মৃত্যু পর্যন্ত উপবাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাভারকারের চিন্তাধারা ইসলামের প্রতি শত্রুতা

সাভারকার সবসময় একটি ইসলাম-বিরোধী হিন্দু জাতীয়তাবাদের আহ্বান জানিয়েছেন। তার মতে, পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে থাকা মুসলমানরা সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতক। তিনি দাবি করেছিলেন যে, সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং জনসেবায় মুসলমানদের সংখ্যা যতটা সম্ভব কমানো উচিত এবং তাদের অস্ত্র কারখানা স্থাপন বা সেগুলোতে কাজ করার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত।

১৯৬৩ সালে লেখা তার বই "হিন্দুস্তানি তারিখ কে ছে দারাখশাঁ আদওয়ার (ভারতীয় ইতিহাসের সোনালী ছয় যুগ)" -এ তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, পুরো ইতিহাস জুড়ে মুসলমান এবং খ্রিস্টানরা হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে এসেছে।

সাভারকারের হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল। এখানে সে এই বিষয়টি খুবই অপছন্দ করেছিল যে, ভারতের মুসলমানরা ইস্তানবুলে অবস্থিত ওসমানী খেলাফতের সঙ্গে সাহায্য ও সহযোগিতার অঙ্গীকার করছে। তার মতে, প্রকৃত শত্রু ব্রিটিশরা নয়, বরং মুসলমানরা, কারণ ইসলামী মতবাদ হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুতর হুমকি।

ফ্যাসিবাদ

সাভারকার তার অনেক লেখনী ও বক্তৃতায় নাৎসি মতবাদকে অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। তিনি সাধারণত জার্মানির জার্মান সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ইহুদি সংখ্যালঘুদের তুলনা ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে করতেন। তিনি উভয় ক্ষেত্রেই জার্মান ইহুদি এবং ভারতীয় মুসলমানদের সমালোচনা করতেন যে, তারা সমাজে মিশে যেতে অক্ষম। ১৯৩৮ সালে তিনি লিখেছিলেন:

> "যদি আমরা হিন্দুরা সময়ের সাথে সাথে ভারতে শক্তিশালী হয়ে উঠি, তবে এই লিগ ধাঁচের মুসলিম বন্ধুদের ক্ষেত্রে জার্মান ইহুদিদের ভূমিকা পালন করতে হবে।"

তবে জার্মান ইহুদিদের বিরোধিতার সত্ত্বেও সাভারকার ইসরায়েল রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সমর্থন করতেন এবং এর প্রতিষ্ঠার সময় তিনি অভিনন্দন বার্তাও পাঠিয়েছিলেন, কারণ এই রাষ্ট্র মুসলিম আরব বিশ্বের জন্য একটি বড় বিষফোঁড়া ছিল।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ

সাভারকর নিজেকে 'মুলহিদ/নাস্তিক' বলে অভিহিত করতেন, কিন্তু হিন্দু ধর্মে নাস্তিকতা পাশ্চাত্যের নাস্তিকতার থেকে আলাদা। সাভারকর হিন্দু ধর্মের নাস্তিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু ধর্মে "নাস্তিক" বলতে এমন একটি পৃথক সম্প্রদায়কে বোঝানো হয় যারা শুধুমাত্র দেবতাদের অস্বীকার করে। তবে, ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, বহু বিশ্বাস এবং জটিল দার্শনিক তত্ত্বে তাদের বিশ্বাস থাকে এবং এগুলোকেও পবিত্র মনে করে, যেমনটি হিন্দু ধর্মে পবিত্র হিসেবে বিবেচিত।

তবে সম্ভবত "নাস্তিক" হওয়ার কারণেই সাভারকর হিন্দুদেরকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে তাদের একটি জাতি হিসেবে দেখেছেন। এবং হিন্দুত্ববাদকে হিন্দু ধর্মের অংশ বলে অভিহিত না করে, বরং হিন্দু ধর্মকে হিন্দুত্ববাদের একটি অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সাভারকার স্থানীয় ধর্মগুলোর মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি যে সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন হিন্দুর বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার মতে, সব ধর্মের অনুসারীদের "হিন্দু" বলা যেতে পারে। তাই তার মতে, এই সমস্ত স্থানীয় ধর্মই মূলত হিন্দুধর্মের অংশ।

এর বিপরীতে সেমেটিক ধর্মগুলো ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই তারা কখনোই এই জাতির অংশ হতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন যে, যেহেতু সেমেটিক ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থানগুলো মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত, তাই তাদের আনুগত্য কখনোই সম্পূর্ণভাবে ভারতের সাথে হতে পারে না।

সাভারকরের চেষ্টা ছিল যে, তাঁর তৈরি করা হিন্দু ধর্মের নতুন সংজ্ঞার মাধ্যমে সকল ধর্মীয় মতাদর্শের অনুসারীরা হিন্দু হিসেবে পরিচিত হবেন, কিন্তু এই সংজ্ঞাটি বাস্তবিকভাবে প্রচলিত হতে পারেনি এবং আজ পর্যন্ত হিন্দু শব্দটি সেই ব্যক্তির জন্যই ব্যবহৃত হয়, যে হিন্দু ধর্মের অনুসারী। অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসারীরা হিন্দু হিসেবে পরিচিত হতে পারেন না। তবে সাভারকর কর্তৃক শব্দ 'হিন্দু'র সংজ্ঞা আজও সংঘপরিবার তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এম. এস. গোলওয়ালকর

মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এর দ্বিতীয় প্রধান ছিলেন। গোলওয়ালকর হিন্দুত্ববাদের ধারণাকে প্রাচীন হিন্দু দর্শন এবং আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে নতুন রূপে সাজিয়ে তা হিন্দু জনগণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। সংঘ পরিবারে গোলওয়ালকরকে "গুরুজি" বলা হয় এবং সেই সময়ে তিনি সংঘের সবচেয়ে জনপ্রিয় চিন্তাবিদ ছিলেন। বিশ্লেষকদের মতে, হিন্দুত্ববাদ আন্দোলনের সবচেয়ে সৎ ও পরিস্কার ব্যাখ্যা গোলওয়ালকর দিয়েছেন, যেখানে অন্যান্য চিন্তাবিদরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কথার মোড়ক ব্যবহার করেছেন।

গোলওয়ালকর ১৯০৬ সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুরের কাছে মাধো নামক গ্রামে মারাঠি করথাড়ে ব্রাহ্মণ পরিবারে[৬] জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই গোলওয়ালকর হিন্দু ধর্ম এবং তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ধ্যানের প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন।

১৯২২ সালে গোলওয়ালকর নাগপুরের একটি মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসলোপ কলেজে (Hislop College) ভর্তি হন। বলা হয় যে, কলেজে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারে তাকে খুব রেগে যেতে দেখা যেত এবং এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে তার হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্য কাজ করার প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৪ সালে গোলওয়ালকর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি মদন মোহন মালাবিয়া (Madan Mohan Malaviya) দ্বারা অনেক প্রভাবিত হন, যিনি একজন জাতীয়তাবাদী নেতা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর শিক্ষকতাও করেন। তার ছাত্ররা তার দীর্ঘ দাড়ি, লম্বা চুল এবং সাদামাটা পোশাক দেখে তাকে 'গুরুজি' বলে ডাকতেন। পরবর্তীতে আরএসএসে তার অনুগামীরা তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে একই রকম সুরত ধারণ করতেন। এরপর গোলওয়ালকর নাগপুর ফিরে এসে ১৯৩৫ সালে আইন শাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করেন।

---

[৬] করথাড়ে ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণদের একটি উপশাখা।

তার বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় ভাইয়াজি দানি (Bhaiyaji Dani), বেনারসে আরএসএস শাখা শুরু করেছিলেন।[৭] তিনি আরএসএস-এর প্রথম সর্বভারতীয় প্রধান কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের (Keshav Baliram Hedgewar) ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। গোলওয়ালকর এই সভাগুলোতে যেতেন। ১৯৩১ সালে যখন হেডগেওয়ার বেনারস ভ্রমণে এসেছিলেন, তখন তিনি গোলওয়ালকরকে খুব পছন্দ করেছিলেন।

নাগপুরে ফিরে আসার পর হেডগোয়ার গোলওয়ালকর-এ দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। হেডগোওয়ারই তাকে বলেছিলেন যে, সে যেন আইন বিষয়ে ডিগ্রি নেয়, কারণ এতে তার দ্বারা সেই সহায়তা পাওয়া যাবে, যা একজন আরএসএস নেতার জন্য প্রয়োজন। ১৯৩৪ সালে হেডগোওয়ার গোলওয়ালকরকে নাগপুর শাখার কার্যনির্বাহী (সেক্রেটারি) হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৩৬ সালে গোলওয়ালকর তার আইন প্র্যাকটিসও ছেড়ে দেন এবং আরএসএসের জন্য কাজ করাও ছেড়ে দেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সারগাচি[৮] রামকৃষ্ণ মিশন[৯] আশ্রমে[১০] চলে যান, যাতে তিনি পৃথিবী ত্যাগ করে একজন সন্ন্যাসী[১১] হয়ে যেতে পারেন। সেখানে তিনি স্বামী অখণ্ড আনন্দ (Akhandmanda) এর শিষ্য হন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে অখণ্ড আনন্দের মৃত্যুর পর তিনি আশ্রম ছেড়ে দেন এবং ফিরে আসেন নাগপুরে। হেডগেওয়ার তাকে বোঝান যে, সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব এভাবেই পূর্ণ হতে পারে, যদি তিনি আরএসএসের জন্য কাজ করেন।

আরএসএস-এ পুনরায় যোগদানের পর হেডগেওয়ার গোলওয়ালকরকে প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ শুরু করেন। তাকে অল ইন্ডিয়া অফিসার্সের প্রশিক্ষণ শিবিরের ইনচার্জ করে দেন। তিনি ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে গোলওয়ালকরকে সাভারকরের মারাঠি ভাষার বই "রাষ্ট্র মেমানস" (জাতীয়তাবাদ) এর হিন্দি এবং ইংরেজি অনুবাদ করতে বলা হয়। এর ফলস্বরূপ "উই, অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড" (We, or Our Nationhood Defined)[১২] বইটি

---

[৭] আরএসএস-এর কোনো অঞ্চলের শাখাকে 'শাখা' অথবা 'শাখ' বলা হয়। সবচেয়ে মৌলিক শাখায় দৈনিক সভা হয় যেখানে খেলা, গান, সবাশত (সংস্কৃত কবিতা) এবং যোগ ব্যায়াম ইত্যাদি গুরুত্বসহকারে করা হয়।

[৮] সারগাচি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার একটি এলাকা।

[৯] রামকৃষ্ণ মিশন একটি হিন্দু ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগঠন, যা সারা বিশ্বে সাধারণ কৃষ্ণ আন্দোলন বা বৈদান্তিক আন্দোলন নামে আশ্রম পরিচালনা করে।

[১০] আশ্রম (Ashrama) হিন্দুদের মঠ বা খানকাহকে বলা হয়।

[১১] সন্ন্যাসী সেই ব্যক্তি, যিনি দুনিয়া ত্যাগ করে নিজেকে হিন্দু ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার জন্য নিবেদিত করেন।

[১২] এই বিষয়ে দুটি মত রয়েছে-

গোলওয়ালকরের নামে প্রকাশিত হয়। এই বইটিকে আরএসএস-এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়।

১৯৯০ সালে গুরুদক্ষিণা (Gurudakshina)[১৩] অনুষ্ঠানে হেডগেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন যে, পরবর্তী প্রধান কার্যনির্বাহী (জেনারেল সেক্রেটারি)[১৪] গোলওয়ালকর হবেন। ১৯৪০ সালে নিজের মৃত্যু আগে হেডগেওয়ার গোলওয়ালকরকে আরএসএস-এর প্রধান হওয়ার জন্য বলেছিলেন। এবং তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্য পদমর্যাদার পাঁচজন সংঘ চালক নাগপুরে হেডগেওয়ারের এই সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেন।

গোলওয়ালকর এর নির্বাচন বেশিরভাগ স্বয়ংসেবকদের[১৫] জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। তবে বলা হয়, হেডগেওয়ারের অনেক সিনিয়র সদস্যকে উপেক্ষা করে গোলওয়ালকরকে নির্বাচিত করার প্রধান কারণ ছিল যে, হেডগেওয়ারের মতে, গোলওয়ালকর একমাত্র এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আরএসএস এর স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম ছিলেন। এটিকে হিন্দু মহাসভার যুব শাখা হিসেবে দেখা হত না।

গোলওয়ালকর ১৯৭১ সালে তার মৃত্যু অবধি, অর্থাৎ ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আরএসএস-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে তিনি সংগঠনটিকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেন। সমাজ-জীবনের প্রতিটি অংশে এই সংগঠনের বিভিন্ন শাখা গঠন করা হয়েছিল। এছাড়া, বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্যও পৃথক উপ-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পদক্ষেপগুলোর ফলস্বরূপ আরএসএস ভারতে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের রূপ নেয়।

ভারত বিভাগের সময় সংযুক্ত প্রদেশের[১৬] পুলিশ আরএসএসের কেন্দ্রে অভিযান চালায়, যেখানে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দেশভাগের সময় আরএসএসের যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা ছিল, এবং এর

এক- এটি সাভারকর এর রচনা।
দুই- এই রচনার ভিত্তি করে গোলওয়ালকর তার নিজে এটি লিখেছেন।
গোলওয়ালকর তার বইয়ের প্রস্তাবে লিখেছেন যে সাভারকরের বইকে ভিত্তি করে এই বইটি লেখা হয়েছে এবং এটি তার নিজস্ব লেখা, এবং ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এটাই সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। তবে ১৯৬৩ সালের পর এটি আরএসএস এর শাখাগুলোর পক্ষ থেকে একটি মত প্রকাশিত হয় যে, গোলওয়ালকর এই বইটির কেবল প্রস্তাবনা এবং ভূমিকা লিখেছেন, বইটির বাকি অংশ মূলত সাভারকরের বইয়েরই অনুবাদ।

১৩ যদি কোনও শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষক, গুরুকে সম্মান প্রদর্শন করার একটি অনুষ্ঠান
১৪ সারকারিয়াহ বা প্রধান কার্যনির্বাহী হচ্ছে আরএসএসের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ।
১৫ স্বয়ংসেবক মানে হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক
১৬ ব্রিটিশ শাসনের অধীনের একটি প্রদেশ, যা বর্তমান উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড নিয়ে গঠিত ছিল।

পরিকল্পনাকারী ছিল গোলওয়ালকর। তবে সংযুক্ত প্রদেশের সরকার গোলওয়ালকরকে গ্রেপ্তার করতে দ্বিধা প্রদর্শন করে এবং এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে গোলওয়ালকর প্রদেশ থেকে পালিয়ে যায়।

১৯৩৮ সালে গান্ধী হত্যার পর এটি সর্বত্র প্রচলিত হয় যে, আরএসএস এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত। গোলওয়ালকর এবং সংগঠনের ২০ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। আরএসএসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ছয় মাস পর গোলওয়ালকরকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু আরএসএসের ওপর নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকে।

গোলওয়ালকর সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে আলোচনা চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। সরকারের দাবি ছিল যে, আরএসএস তাদের লিখিত সংবিধান তৈরি করুক, যাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, সংগঠনের ধারণা কী এবং তাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে। গোলওয়ালকর এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন (satyagraha campaigns)[১৭] শুরু করেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাকে এবং আরএসএসের ২০,০০০ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৯ সালে আরএসএসের অন্যান্য নেতারা সত্যাগ্রহ বন্ধ করে এবং একটি লিখিত সংবিধান তৈরি করেন, যা সরকার মেনে নেয়। এর ফলে আরএসএসের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। সরকার ঘোষণা করে যে, গোলওয়ালকরের ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য এবং ভারতের জাতীয় পতাকা তেরঙ্গাকে গ্রহণ ও সম্মান করার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

১৭ গান্ধীজীর অহিংস প্রতিরোধের দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোলওয়ালকর-এর চিন্তাধারা ব্রিটিশ রাজের সমর্থন

আকর্ষণীয় বিষয় হলো যে সাভারকরের মতো গোলওয়ালকরও ব্রিটিশ রাজবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। অর্থাৎ, হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের দুই মূল তাত্ত্বিক রচয়িতা আসলে ব্রিটিশ রাজের সমর্থক ছিলেন। এজন্য গোলওয়ালকর-এর সময়ে আরএসএস স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং এর ফলে হিন্দু মহাসভার সাথে এর সম্পর্কেও দুর্বলতা এসেছিল। আরএসএস স্লোগান দিয়েছিল যে, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা হবে ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষার মাধ্যমে, এবং ব্রিটিশ রাজ থেকে মুক্তির কোনও উল্লেখ ছিল না। গোলওয়ালকর-এর মতে, ব্রিটিশ বিরোধিতাকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সাথে যুক্ত করা একটি প্রতিক্রিয়া জনক তত্ত্ব, যা অত্যন্ত বিধ্বংসী হতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের গোপন সমর্থনের জন্য গোলওয়ালকর আরএসএসের প্ল্যাটফর্ম থেকে এই স্লোগানটি দিয়েছিলেন যে, হিন্দু ধর্ম জাপানি আক্রমণের হুমকিতে রয়েছে, এবং আরএসএসকে সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের ক্ষেত্রে দেশ ও স্বার্থের সুরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

হিন্দু জাতি ভারতের আসল বাসিন্দা

সাভারকর তার 'হিন্দুত্বভা' বইয়ে এই ধারণাটি গ্রহণ করেছে যে, আর্য জাতি ভারতের বাইরে থেকে এসে সিন্ধু নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের মতে, আর্য জাতি আসার আগে এই অঞ্চলকে 'হিন্দ' বলা হত এবং এই নদীটির নামও সিন্ধু ছিল না, বরং 'হিন্দ' ছিল। যখন আর্য জাতি এখানে বসতি স্থাপন করল, তখন তারা স্থানীয় নামগুলোকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করেছিল, যার ফলে 'হিন্দ' হয়ে 'সিন্ধু' হয়ে গিয়েছিল। এবং সিন্ধু নদীর তীরে বসবাস করার কারণে আর্য জাতি 'সিন্ধু' নামে পরিচিত হয়, যা পরে স্থানীয় ভাষার প্রভাবে 'হিন্দু' হয়ে যায়। কিন্তু মজার বিষয় হলো, গোলওয়ালকর এই কথা মেনে নেয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদে সাভারকরকে একজন বড় নেতা হিসেবে মান্য করা হয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপর লেখা সাভাকরের বইটি

হয়তো হুবহু অনুবাদ নয়, তবে সেটা অন্তত তার বইয়ের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। তবে এই বিষয়টিতে তিনি সাভারকরের মতের সঙ্গে একমত নন।

গোলওয়ালকর এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, হিন্দুরা একই ভূমির সন্তান এবং তারা সর্বদা এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। পশ্চিমা মানববিদদের গবেষণাগুলোতে যে বলা হয়েছিল যে, হিন্দুরা আর্য বংশোদ্ভূত এবং তারা যাযাবর ছিল। পানির সন্ধানে বিভিন্ন স্থান পরিবর্তন করে সিন্ধু নদীর তীরে এসে বসবাস করেছিল- তার বিরুদ্ধে গোলওয়ালকর লেখেন যে, পশ্চিমারা তাদের সাদা চামড়ার অহংকারে মগ্ন এবং এটি তাদের চিন্তা ও গবেষণার ওপর পর্দা ফেলছে। তবে গোলওয়ালকর কোথাও একটুও উল্লেখ করেননি যে, তার গুরু সাভারকরও এই মতামতটি গ্রহণ করেছিলেন। তবে প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক (Bal Gangadhar Tilak) ১৯০৩ সালে "দ্য আর্কটিক হোম ইন দ্য ভেদাস (The Arctic Home in the Vedas - এটির বাংলা অর্থ হচ্ছে- বেদের বর্ণনা অনুসারে উত্তর মেরুতে বাসস্থান) নামক একটি বই লিখে একটি আকর্ষণীয় দাবি করেছিলেন যে, হিন্দুদের প্রাচীন বিখ্যাত বেদগুলো[১৮] উত্তর মেরুতে বরফযুগে লেখা হয়েছিল। এবং এটি ছিল আর্য বংশের আসল ভূমি। এরপর পরবর্তী মহা বরফবৃষ্টি যুগের কারণে আর্যরা ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বে দক্ষিণে অভিবাসন করে এবং এই জ্ঞানও তাদের সাথে নিয়ে এসেছিল। এর উত্তরে গোলওয়ালকর একটি হাস্যকর দাবি করেন যে, যুদ্ধের কথা ঠিক, কিন্তু তারা হয়তো জানেন না যে অভিবাসন আমরা করিনি, বরং উত্তর মেরুই করেছে। তিনি বারানসি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বীরবল সাহেনির একটি দাবির উল্লেখ করে লিখেছেন:

> "উত্তরের মেরু একটি স্থির বস্তু নয় এবং অনেক সময় আগে এটি পৃথিবীর সেই অংশে ছিল, যাকে আজ আমরা বিহার এবং ওড়িশা বলে চিহ্নিত করি। এরপর এটি উত্তর-পূর্ব দিকে চলতে শুরু করে, কিছু সময় পর এটি কখনো পশ্চিমে এবং কখনো উত্তরে গমন করে বর্তমানে এর যে অবস্থানে রয়েছে সেখানে পৌঁছায়। যদি এমন হয়, তবে কি আমরা উত্তর মেরুকে ছেড়ে এসে ভারতবর্ষে বসবাস করতে এসেছি, নাকি আমরা সব সময়ই এক জায়গাতেই বসবাস করছিলাম এবং উত্তর মেরু আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে এবং উত্তর দিকে পাঁকা ভাবে চলে গেছে? আমাদের এটা বলতে কোন ধরনের দ্বিধা

---

[১৮] সংস্কৃত ভাষায় লেখা হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ।

নেই যে, যদি 'লোক তিলক'[১৯] এর জীবনে এই সত্যটি উদঘাটিত হতো, তবে তারা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতেন যে, ঋগবেদে যে উত্তর মেরুর ঘরের কথা উল্লেখ আছে, তা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষেই ছিল এবং হিন্দুরা এই ভূমিতে অভিবাসন করেনি, বরং উত্তর মেরু এখান থেকে অভিবাসিত হয়ে হিন্দুদের ভারত ছাড়িয়ে চলে গেছে।"[২০]

আরও এগিয়ে গিয়ে গোলওয়ালকর লেখেন:

> "আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা হিন্দুরা এই ধরিত্রীতে কোথাও থেকে আসিনি, বরং চিরকাল থেকেই এই ধরিত্রীর সন্তান। তাই এই দেশের স্বাভাবিক শাসক আমরা।"[২১]

হিন্দ জাতি ঈশ্বর স্বরূপ

গোলওয়ালকর হিন্দু জাতির মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে এতটা এগিয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি দাবি করেছিলেন যে, হিন্দু জাতি সমষ্টিগত ভাবে নিজেই এক ঈশ্বর। তিনি লিখেন:

> "আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলতেন, আমাদের মানুষই আমাদের ঈশ্বর। শ্রী রাম কৃষ্ণ, যিনি মানবতার মহান শিক্ষকগণের একজন, বলেছিলেন, মানুষ সেবা করো। তাঁর মহান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও একই কথা বলতেন। কিন্তু যখন মানুষকে পূর্ণ মানবতার পরিসরে দেখানো হবে, তখন এটি একটি খুব বিস্তৃত পরিভাষা, এবং তাই একে সহজভাবে একটি একক হিসেবে দেখা এবং অনুভব করা অনেক কঠিন। তাই এমন হল যে, অনেক মানুষ যারা মানবতার সেবার চিন্তা নিয়ে উঠেছিল, তারা কিছুই করতে পারল না। তাই আমাদের পূর্বপুরুষরা, মানব মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখে বলেছিলেন, মানবতা ও সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে কেউ যদি সেই স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, তাহলে ঈশ্বরের ধারণা কিছু সীমাবদ্ধতা সহ রাখা প্রয়োজন, যা কেউ বুঝতে, অনুভব করতে এবং সেবা করতে

[১৯] বাল গঙ্গাধর তিলক'কে 'লোকমান্য তিলক'ও বলা হয়। 'লোকমান্য' মানে হল, যাকে মানুষ পথপ্রদর্শক হিসেবে মান্য করে।

[২০] উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড (We or Our Nationhood Defined) – এম. এস. গোলওয়ালকর পৃষ্ঠা: ৪৫

[২১] উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড (We or Our Nationhood Defined) – এম. এস. গোলওয়ালকর পৃষ্ঠা: ৪৬

পারবে। তারা বলেছিলেন যে হিন্দু জাতি ভারত পুরুষ, অর্থাৎ ঈশ্বরের অঙ্গ। যদিও তারা মহেন্দ্র শব্দটি ব্যবহার করেননি, তবে এই ঈশ্বরের সংজ্ঞা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যার মধ্যে বলা হয়েছে, সূর্য এবং চন্দ্র তার চোখ, তার নাভি থেকে নক্ষত্র ও আকাশ সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ তার মাথা, ক্ষত্রিয় তার হাত, বৈশ্য তার পা এবং শূদ্র তার পা। এর মানে হল, যারা এই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, অর্থাৎ হিন্দু জাতি, তারা আমাদের ঈশ্বর।"[২২]

ফ্যাসিবাদ

গোলওয়ালকর রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতার মতো পৌরাণিক কাহিনির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, হিন্দু জাতি সেই সময় থেকেই একটি সভ্য জাতি, যখন অন্যান্য বিশ্বের সভ্যতার কোনো ধারণা ছিল না এবং যখন ব্যাবিলনীয় সভ্যতারও কোনো চিহ্ন ছিল না। আরেক জায়গায়, গোলওয়ালকর হিন্দু জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন:

> "আমাদের জাতির উৎপত্তি, অর্থাৎ সেই ইতিহাস, যখন আমরা এখানে একটি সভ্য জাতি হিসেবে বসবাস শুরু করি, তা ইতিহাসবিদদের জন্য অজ্ঞাত। একদিক থেকে আমরা "অনাদি", অর্থাৎ যার কোনো শুরু নেই।"
>
> "আমরা যখন থেকে উপস্থিত, তখন কোনো ধরনের নামের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। আমরা ভালো এবং সক্ষম দৃষ্টি সম্পন্ন লোক ছিলাম। আমরা সেই মানুষ ছিলাম, যারা প্রকৃতির আইন এবং আত্মার আইন সম্পর্কে জানতাম। আমরা একটি মহান সভ্যতা, একটি মহান সংস্কৃতি এবং একটি অনন্য সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম। মানবজাতির জন্য উপকারী সকল কিছু আমরা প্রায় সবই সৃষ্টি করেছি। যখন অন্যান্য সব মানুষ শুধুমাত্র দুই পায়ে চলা প্রাণী ছিল, তখন আমাদের আলাদা করার জন্য কোনো নাম দেওয়া হয়নি। কখনো কখনো, আমাদের অন্যান্য মানুষদের থেকে আলাদা দেখানোর জন্য 'অহল-বাসিরাত' বলা হতো, অর্থাৎ আর্য, এবং অন্যান্য সবাই ছিল 'মেলেছ'। যখন বাইরের ভূমিতে বিভিন্ন বিশ্বাস সময়ের সঙ্গে সামনে আসতে শুরু করলো এবং এই অচেনা বিশ্বাসগুলো আমাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে লাগলো, তখন নাম রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো।"

[২২] বাঞ্চ অফ থটস (Bunch of Thoughts) এম. এস. গোলওয়ালকর পৃষ্ঠা: ৪৬, ৪৭

"এবং হিন্দু নামটি, যা সিন্ধু নদী থেকে নেওয়া হয়েছে, আমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যে এত দীর্ঘ সময় ধরে জড়িত যে এখন এটি আমাদের সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত এবং পছন্দ করা নাম।"[২৩]

স্পষ্টতই, যখন কেউ তার জাতির প্রশংসা ও স্তুতির ক্ষেত্রে এত বেশি বাড়াবাড়ি করে যে, সে তার জাতিকে জ্ঞানী এবং অন্যদেরকে অপবিত্র (নাপাক) মনে করে, এমনকি তাদেরকে ঈশ্বরের স্তরের সমান বলে মনে করে, তখন তার যৌক্তিক ফলাফল হল যে, সে অন্য সমস্ত জাতিকে তার জাতির চেয়ে তুচ্ছ মনে করবে এবং নিজেকে তাদের চেয়ে উচ্চতর ও শাসক হিসেবে ভাববে। যে কোন জাতির মাঝে যদি জাতিগত গর্ব তৈরি হয়, তারা অন্য জাতি ও জাতিকে নিজেদের চেয়ে তুচ্ছ মনে করে, যেমন ইহুদিদের জায়োনিস্ট আন্দোলন এবং জার্মানির নাৎসি আন্দোলন অন্য জাতিকে নিজেদের চেয়ে তুচ্ছ মনে করে, ঠিক তেমনই হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও এই মনোভাব রয়েছে। গোলওয়ালকরও জাতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নাৎসি জার্মানির প্রভাবিত ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি লিখেছেন:

"নিজের জাতি এবং সংস্কৃতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য, জার্মানি তাদের দেশে সেমেটিক জাতিগুলোর (অর্থাৎ ইহুদিদের) উপস্থিতি মুছে দিয়ে বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। এখানে জাতিগত অহংকারের প্রকাশ সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। জার্মানি আরও দেখিয়েছিল যে, কিভাবে এমন জাতি ও সংস্কৃতিগুলোর জন্য, যাদের ভিত্তিতেই বৈষম্য বিদ্যমান, এক ঐক্যবদ্ধ শরীর হিসেবে একসঙ্গে চলা একেবারেই অসম্ভব। এটি আমাদের জন্য, ভারতের জন্য, শেখার এবং তা থেকে উপকার নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ।"[২৪]

গোলওয়ালকর জন্মগত/বংশীয় উপাদানকে জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য করেন। তাঁর মতে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শুধুমাত্র তখনই সমাজে মিশে যেতে পারে, যদি তারা তাদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করে, কারণ হিন্দু রীতিনীতি জাতীয়, কিন্তু সংখ্যালঘুদের রীতিনীতি বাইরের। তাঁর বইয়ে তিনি লেখেন:

"ভারতে যে বাইরের জাতি বা গোষ্ঠী রয়েছে, তারা অবশ্যই হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করবে, হিন্দু ধর্মের সম্মান করতে শিখবে, হিন্দু জাতি ও

[২৩] বাঞ্চ অফ থটস (Bunch of Thoughts) - এম. এস. গোলমালকার পৃষ্ঠা: ৬০, ৬১

[২৪] উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড (We or Our Nationhood Defined) – এম. এস. গোলওয়ালকর পৃষ্ঠা: ৮৭, ৮৮

সংস্কৃতির প্রশংসা করা ছাড়া অন্য কোনো ধারণা মাথায় আনবে না এবং তাদের আলাদা অস্তিত্ব বিলীন করে হিন্দু জাতিতে মিশে যাবে, অথবা তারা এই দেশে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু জাতির অধীনে থাকবে, কোনো দাবি করবে না, কোনো লাভ বা সুবিধা তাদের প্রাপ্য হবে না, তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের বিশেষ আচরণ করা হবে না, এমনকি তাদের নাগরিক অধিকারও নিশ্চিত করা হবে না। তাদের সামনে এই ছাড়া আর কোনো পথ থাকা উচিত নয়। আমরা একটি প্রাচীন জাতি, এবং আমাদের এমনভাবেই কাজ করা উচিত, যেমন একটি প্রাচীন জাতি বাইরের জাতির সঙ্গে আচরণ করে বা তাদের করা উচিত।"[২৫]

ইসলাম বিরোধিতা

গোলওয়ালকর-এর মতে, ভারতের মালিক হিন্দুরা, এবং পার্সি ও ইহুদিরা এখানে অতিথি, আর মুসলিম ও খ্রিস্টানরা আক্রমণকারী। জার্মানির নাৎসি মতাদর্শকে গোলওয়ালকর ভারতের মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। তার মতে, মুসলিমরা বিদেশী, যারা হিন্দু সমাজে প্রবেশ করে তা দুর্বল করে দিচ্ছে। তার মতে, মুসলিমরা এখানে স্থানীয় নয়, বরং আক্রমণকারী, যাদের ধর্মীয় কেন্দ্র ভারতের পরিবর্তে মক্কায়।

ভারত ভাগের পর ভারতে বসবাসরত মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে গিয়ে গোলওয়ালকর লিখেছিলেন:

"পুরো দেশে যেখানে কোনো মসজিদ বা মুসলিমপাড়া রয়েছে, সেখানে মুসলিমদের মনে হয় যেন এটি তাদের একটি স্বাধীন দেশ। যদি কোনো হিন্দুদের শোভাযাত্রা গান বাজিয়ে যায়, তবে তারা রেগে যায়, কারণ তারা মনে করে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হয়েছে। যদি তাদের ধর্মীয় অনুভূতি এতটাই সংবেদনশীল হয়ে থাকে যে, মিষ্টি সুরের সঙ্গীতও তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে, তবে তারা কেন তাদের মসজিদগুলো জঙ্গলে স্থানান্তরিত করে না, যেখানে তারা শান্তিপূর্ণভাবে উপাসনা করতে পারে? কেন তারা এই ব্যাপারে অনড় যে, রাস্তায় একটি পাথর বসিয়ে তা সাদা রং দিয়ে চিহ্নিত করে বলে যে,

[২৫] উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড (We or Our Nationhood Defined) – এম. এস. গোলওয়ালকর পৃষ্ঠা: ১০৩, ১০৪

এটি নামাজের জায়গা। তারপর যখন সঙ্গীত বাজে, তখন তারা হইচই করে বলে যে, তাদের নামাজে ব্যাঘাত ঘটানো হয়েছে? ...

... এটি কি স্পষ্ট নয় যে, মুসলমানদের নামধারী ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে আসলে সঙ্গীতের বা নামাজের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এটি শুধুমাত্র এ কারণে করা হয় যে, হিন্দুদের সাথে বিরোধ তৈরি করা যায় এবং নিজেদের ছোট ছোট স্বাধীন সেল গঠন করা যায়?"[২৬]

ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের যুদ্ধের বিষয়ে গোলওয়ালকর লেখেন:

"এই নিষ্ঠুর দিনের পর থেকে, যখন মুসলমানরা প্রথমবার ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিল, আজ পর্যন্ত, হিন্দু জাতি এই লুটেরাদের সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করে আসছে। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপই আজ পাঞ্জাব আমাদের দিকে ফিরে এসেছে, কিন্তু যুদ্ধ এখনও চলবে। এর কোনো সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি এবং এমন কোনো ভয়ও নেই যে, এর সিদ্ধান্ত আমাদের বিপক্ষে হতে পারে। জাতিগত আত্মা জাগ্রত হচ্ছে। সিংহ মারা যায়নি, বরং ঘুমিয়ে ছিল। এখন সে আবার জেগে উঠছে এবং পৃথিবী এই নবজন্ম নেওয়া হিন্দু জাতির শক্তি দেখবে যে, কীভাবে তারা এই শত্রুকে তাদের শক্তিশালী বাহু দিয়ে ধ্বংস করে।"[২৭]

ভারতীয় সংবিধান এবং পতাকার অস্বীকৃতি

গোলওয়ালকর ভারতীয় সেক্যুলার সংবিধান এবং তার পতাকা (তেরঙা) গ্রহণ করতেন না। কিন্তু যখন সরকার গোলওয়ালকর এবং আরএসএস-এর ষাট হাজার কর্মীকে আটক করল এবং সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল, তখন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে এগুলো গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং এগুলোকে সম্মান করার অঙ্গীকার করতে হয়েছিল। তবে এর পরেও আজ পর্যন্ত আরএসএস-এর কার্যালয়ে কখনো কোনো উপলক্ষে তেরঙা পতাকা উত্তোলিত হয়নি, বরং সর্বদা "ভগওয়া ধ্বজ" (গেরুয়া রঙের পতাকা) উত্তোলিত হয়।

গোলওয়ালকর তেরঙা পতাকা নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর বইয়ে লেখেন:

"আমাদের নেতা-নেত্রীরা আমাদের দেশের জন্য একটি নতুন পতাকা পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন। তারা কেন এমনটি করেছেন? এটি শুধুমাত্র বিচ্যুতি এবং

[২৬] বাঞ্চ অফ থটস (Bunch of Thoughts) - এম. এস. গোলওয়ালকর, পৃষ্ঠা: ১৫২, ১৫৩

[২৭] উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড (We or Our Nationhood Defined), এম. এস. গোলওয়ালকর, পৃষ্ঠা: ৫১, ৫২

অনুকরণের বিষয়। এই পতাকাটি কিভাবে সৃষ্টি হলো? ফরাসি বিপ্লবের সময়, ফরাসিরা তাদের পতাকায় তিনটি রঙের স্ট্রাইপ যুক্ত করেছিল যাতে "স্বাধীনতা", "সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব" এর তিনটি মূলনীতি প্রতিফলিত হয়। আমেরিকান বিপ্লবও এই মূলনীতিগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং তারা কিছু পরিবর্তনসহ তিনটি রঙের স্ট্রাইপ গ্রহণ করেছিল। এজন্য আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামীদেরকেও তেরঙ্গা স্ট্রাইপে কিছু আকর্ষণ দেখাতো। সেজন্য কংগ্রেস এটিকে গ্রহণ করেছিল। তারপর এর যুক্তি উপস্থাপন করা হলো যে, এটি দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঐক্যের প্রতীক। জাফরান রঙ হিন্দুদের প্রতীক, সবুজ মুসলমানদের এবং সাদা অন্য সব গোষ্ঠীর জন্য। অহিন্দু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে মুসলমানদের নাম উল্লেখ করা হলো, কারণ আমাদের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশের মনোভাব ছিল মুসলমানদের প্রতি এবং তাদের নাম না নিলে তাদের মতে আমাদের জাতীয়তা পূর্ণ হতো না! যখন কিছু লোক এই যুক্তি নিয়ে আপত্তি তোলে যে, এতে ধর্মীয় বৈষম্যের গন্ধ আছে, তখন একটি নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হলো যে, জাফরান রঙের মানে হলো ত্যাগ, সাদা রঙ পবিত্রতার প্রতীক এবং সবুজ রঙ শান্তির।...

... আজ এই পতাকাকেই আমাদের রাজ্য পতাকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যে রাজ্যের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাহলে, আমাদের কি নিজস্ব কোনো পতাকা ছিল না? হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের কি কোনো জাতীয় প্রতীক ছিল না? সন্দেহ নেই, ছিল। তাহলে কেন এই প্রতীকটি আমাদের মস্তিষ্কে পুরোপুরি অনুপস্থিত?"[২৮]

এইভাবে গোলওয়ালকর ভারতের সংবিধান সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করে লিখছেন:

"আমাদের সংবিধানও অনেক পশ্চিমা দেশের সংবিধানের বেশ কিছু ধারা একত্রিত করে অদ্ভুতভাবে তৈরি করা হয়েছে। এতে এমন কিছুই নেই, যা আমরা আমাদের বলতে পারি। এর মূলনীতিগুলোর মধ্যে কি এমন কোনো শব্দ আছে, যা আমাদের জাতীয় লক্ষ্য এবং আমাদের জীবনযাত্রার ভিত্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়? না! এটি জাতিসংঘের চার্টার বা পূর্ববর্তী লীগ অফ নেশনসের চার্টার থেকে নেওয়া কিছু দুর্বল মূলনীতি এবং কিছু অংশ আমেরিকান ও ব্রিটিশ সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এগুলোকে একত্রিত করে একটি অগোছালো মিশ্রণ তৈরি করা হয়েছে।"[২৯]

[২৮] বাঞ্চ অফ থটস (Bunch of Thoughts) - এম. এস. গোলওয়ালকর, পৃষ্ঠা: ১৮৮

[২৯] বাঞ্চ অফ থটস (Bunch of Thoughts) - এম. এস. গোলওয়ালকর, পৃষ্ঠা: ১৮৮

তৃতীয় অধ্যায়

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ

হিন্দুত্ববাদের চিন্তাবিদদের জীবন ও চিন্তাধারা থেকে হিন্দুত্ববাদের তত্ত্ব এবং তাকে সমর্থনকারী জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্কেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়-

প্রথম পরিচ্ছেদ

তীব্র জাতিগত অহংকার হিন্দুত্ববাদ দর্শনের প্রেরণা

হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা তীব্র জাতিগত অহংকারে বিশ্বাসী এবং নিজেদের পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতির তুলনায় উত্তম মনে করেন। তারা নিজেদেরকে বোধসম্পন্ন মনে করেন, এবং বাকি সব মানুষকে মলিন বা অশুচি হিসেবে বিবেচনা করেন। জার্মান নাজিরা নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে উচ্চতর জাতি মনে করত, কিন্তু ইহুদীরা তাদের থেকেও এগিয়ে নিজেদেরকে ঈশ্বরের পুত্র মনে করত। তবে হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস তাদের থেকেও অনেক বেশি, কারণ তারা নিজেদের জাতিকেই ঈশ্বরের মতন মনে করেন। এমন তীব্র জাতিগত অহংকারের কারণে তাদের ধারণা হয়ে উঠেছে যে, ভারতের অন্য সব জাতিকে তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকতে হবে, তাদেরকে নিজেদের তুলনায় নীচু মনে করতে হবে, তাদের আচার-অনুষ্ঠানকে নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে, এবং তাদের পবিত্র বিষয়বস্তুগুলোকে নিজেদের পবিত্র বিষয়বস্তু থেকে আরো পবিত্র মনে করতে হবে। তবেই তারা ভারতের মধ্যে বসবাসের অধিকার পাবে, অন্যথায় তাদের এখানে থাকার কোন অধিকার নেই।

হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন

হিন্দু ধর্ম দেবদেবীর কাহিনী, হাস্যকর বিশ্বাস এবং জটিল ও পারস্পরিক বিপরীত দর্শনগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি ধর্ম। যখন ইসলাম এই অঞ্চলে প্রচলিত হলো, তখন বুদ্ধিমান এবং বুঝদার অনেক মানুষ এদিকে আগ্রহী হলো এবং মানুষ দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল। ফলে ইসলামের কারণে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব হুমকির মুখে

পড়ল, যার ফলে হিন্দুত্ববাদ মতবাদের মধ্যে মুসলমানদেরই প্রথম শত্রু হিসেবে দেখা হয়।

হিন্দু জাতি জাত-পাত এবং শ্রেণি-বিভাগে মারাত্মকভাবে বিভক্ত। এমনকি নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা মৌলিক মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত। হিন্দু সমাজে তাদের জীবন দাসদের থেকেও আরও খারাপ ছিল, যার ফলে যখন মুসলমানরা এসেছিল এবং বিশেষত যখন মুসলমানরা শাসক হল, তখন নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের একটি বড় অংশ মুসলমান হওয়া শুরু করেছিল, যাতে তারা সমাজে তাদের অবস্থান উন্নীত করতে পারে। তবে সময়ের সাথে সাথে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে থাকার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও সেই একই জাত-পাতের ভেদাভেদ শুরু হয়ে যায় এবং তারা নিম্নবর্গীয় হিন্দুদেরকে তুচ্ছ মনে করতে শুরু করে। এর থেকেও এগিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যেই জাত-পাতের বিভাজন শুরু হয়ে যায়। তারপর যখন ব্রিটিশ শাসকরা হল, তখন নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের জন্য সমাজে তাদের অবস্থান উন্নীত করার আরেকটি সুযোগ এসেছিল এবং তাদের একটি বড় অংশ খ্রিস্টান হতে শুরু করেছিল। তাই হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কাছে প্রধান শত্রু মুসলমান, আর দ্বিতীয় শত্রু হল খ্রিস্টান। এবং এই আন্দোলন এই দুই ধর্মকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার দাবি করছে।

খিলাফত আন্দোলন

হিন্দুদের মধ্যে জাতিগত অহংকার এবং তাদের অস্তিত্বের প্রতি বিপদের আশঙ্কা আগেই ছিল, কিন্তু যে জিনিসটি হিন্দু জাতীয়তাবাদীদেরকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং হিন্দুত্ববাদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ছিল উপমহাদেশে চলমান খিলাফত আন্দোলন, যার সূচনা ১৯১৫ সালে হয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হয়েছিল এই কারণে যে, কেন ভারতবর্ষে বাস করেও মুসলমানদের হৃদয় তুরস্কে অবস্থিত খিলাফতের প্রতি আন্দোলিত হয়। এর স্পষ্ট অর্থ হলো, তাদের সমস্ত আনুগত্য এবং সহানুভূতি ভারতবর্ষের চেয়ে তাদের ধর্মীয় পবিত্রতাগুলোর প্রতি এবং ভারতবর্ষের বাইরের তাদের জনগণের প্রতি। এই বিষয়ে মুসলমানরা একদম একাত্ম, অথচ হিন্দুরা, ভারতবর্ষে বাস করেও, একই জাতি এবং বংশ হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ নয়। এ কারণেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোও খিলাফত আন্দোলনের পর পরই গড়ে উঠেছিল। সাভারকরও নিজে স্বীকার করেছেন যে, তিনি "বন্দে মাতরম" এর ধারণা খিলাফত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

দৃঢ় সংকল্পের অভাব

সাভারকর এবং গোলওয়ালকর ও তাদের জীবনযাত্রা এবং এমন অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের জীবনযাত্রা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তাদের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের অভাব রয়েছে। সাভারকর কালাপানি কারাগারে এক মাসও কষ্ট সহ্য করতে পারেননি এবং করুণা চেয়ে আবেদন করে বলেছিলেন যে, তিনি তার সমস্ত কাজ থেকে তওবা করছেন, ব্রিটিশ রাজের প্রতি অনুগত থাকবেন এবং অন্যান্য এমন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী লোকদেরও একইভাবে বিশ্বাসী করতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এবং পরবর্তীতে তিনি এই প্রতিজ্ঞায় স্থির ছিলেন।

এই বিষয়টি গোলওয়ালকরের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, স্বাধীন ভারতের সেকুলার সংবিধান তৈরি এবং তেরঙ্গাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রতি তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও যখন কঠোরতা আসলো এবং গ্রেফতারি চললো, এবং আরএসএস-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো, তখন তারা তৎক্ষণাৎ তাদের মতাদর্শ থেকে পিছু হটল এবং ভারতের সেকুলার সংবিধানকেও মেনে নিল এবং এর প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিল, তেরঙ্গাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করল এবং এর প্রতি সম্মান দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিল।

এই আচরণ থেকে এটি বোঝা যায় যে, শেষ পর্যন্ত কেন হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো এবং হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ভারতভাগের কাছাকাছি সময়েই ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন এই জাতীয়তাবাদীরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা ভারতের মধ্যে প্রভাবশালী হতে যাচ্ছে, তখন তারা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এবং যখন ভারত স্বাধীন হলো এবং হিন্দুরা প্রধান শক্তি হিসেবে সামনে এল, তখন তারা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলো। তবে তারা পুরোপুরি প্রকাশ্যে আসেনি

যতক্ষণ না তারা ক্ষমতা লাভ করেছিল। যখন তারা ক্ষমতা পেয়ে গেল, তখন তারা সমস্ত মুখোশ তুলে ফেললো এবং তাদের আসল ভয়ংকর চেহারা নিয়ে একেবারে নির্ভীকভাবে সামনে এসে দাঁড়ালো।

নীতির চেয়ে স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া

হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা তাদের নীতির প্রতি তখন পর্যন্তই অবিচল থাকে, যতক্ষণ না তাদের স্বার্থে ক্ষতি হচ্ছে। যদি কোথাও তাদের স্বার্থে ক্ষতি ঘটে, তবে তারা তৎক্ষণাৎ তাদের নীতির ত্যাগ করে। সাভারকর ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী ছিলেন এবং তার মতে, এবং এই জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের দৃষ্টিতেও,- খ্রিস্টানদের অবস্থান ছিল শত্রু এবং আক্রমণকারী হিসেবে। কিন্তু যেহেতু ব্রিটেন শাসক ছিল এবং সরকার বিরোধী কাজের ফলাফল কঠিন হতে পারে, এবং তাদের অভিধানে “ধৈর্য” শব্দটি ছিল না, তাই তারা নিজেদের স্বার্থে নীতিকে ত্যাগ করে এবং সাভারকর ও গোলওয়ালকর উভয়ই এবং তাদের সংগঠনগুলো, হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস, ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকল, বরং তারা ব্রিটিশ রাজের সমর্থন করল এবং এটি মাথায় নেয়নি যে, এরাই সেই খ্রিস্টান আক্রমণকারী, যাদের বিরুদ্ধে তারা হিন্দুদের দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল।

এই ঘটনা ভারতের স্বাধীনতার পরও চলতে থাকে। গোলওয়ালকর এবং আরএসএস ভারতীয় সংবিধান এবং তেরঙা পতাকার কঠোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এই বিরোধিতার কারণে যখন তাদের জেলে যেতে হয়েছিল এবং আরএসএস-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, তখন এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য এবং কঠোরতা থেকে বাঁচতে তারা তাদের নীতির সাথে আপস করে এবং একটি লিখিত সংবিধান তৈরি করে, ভারতের সংবিধান মেনে চলা এবং তেরঙা পতাকাকে গ্রহণ ও সম্মান করার অঙ্গীকার করে।

নির্লজ্জ মিথ্যাচার এবং অতিরঞ্জন

মুসলিম এবং খ্রিষ্টানদের উপর এটি অভিযোগ করা হয় যে তারা বাইরের আক্রমণকারী, তারা ভারতের স্থানীয় নয়। এবং এই ভূমিতে মূল অধিকার হিন্দুদের। তবে যখন এই প্রশ্নটি উঠে আসে যে, হিন্দুরাও তো আর্য বংশোদ্ভূত, যারা এই ভূমিতে অন্য কোথাও থেকে এসেছিল। তখন এক হিন্দু অতিরঞ্জন করে বলেছিল যে, হিন্দুরা উত্তর মেরু

থেকে এসেছিল এবং তাদের প্রাচিন ধর্মগ্রন্থ উত্তর মেরুতে বরফযুগে লেখা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু এই ধারণার মাধ্যমে হিন্দুরাও এই ভূমিতে স্থানীয় হওয়ার দাবি হারিয়ে ফেলে, ফলে তাদের আর কোনো অধিকার থাকে না মুসলিমদের এখানে বহিরাগত বলার, কারণ সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী তারা নিজেও বহিরাগত হয়ে যায়। কিন্তু এটি তাদের নিজ ধর্মীয় শাস্ত্রেও লেখা ছিল যে, আর্যরা উত্তর মেরু থেকে এসেছিল, তাহলে এ ব্যাপারটি অস্বীকার কিভাবে সম্ভব? এই সমস্যার সমাধানের জন্য গোলওয়ালকর এক অদ্ভুত মিথ্যা রচনা করেছিল যে, উত্তর মেরু প্রথমে ভারতেই ছিল এবং হিন্দুরা এই অঞ্চলে আসেনি, বরং উত্তর মেরু এখানে থেকে চলে গিয়েছিল। যুক্তি এবং বোধের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কতটা বোকামি, সে সম্পর্কে তার কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। একইভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এই ধরনের মিথ্যা রচনা করে চলেছে এবং তাদের পুরো ইতিহাসই এই ধরনের অমূলক মিথ্যা এবং কল্পকাহিনীতে পূর্ণ।

ভিকটিম কার্ড খেলা এবং অধিকার হারানোর মায়াকান্না

আরেকটি বিষয় যা সকল হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়, তা হলো তারা সব সময় ভিকটিম কার্ড খেলে এবং অধিকার হারানোর মায়াকান্না করে। তাদের দাবি, শতাব্দীজুড়ে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অবিচারের পাহাড় ভেঙে চলেছে। তাদেরকে ভারত থেকে নির্মূল করা এবং বিতাড়িত করা অত্যন্ত জরুরি, নতুবা তারা আবার শক্তি অর্জন করে আমাদের খুন করে ফেলবে। ঠিক একইভাবে, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা কান্না করছেন যে, তাদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে, মুসলমানদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, অথচ হিন্দুদের অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। সবচেয়ে বড় কথা, আজ তাদের নিজস্ব শাসনকাল চলছে, মুসলমানদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে বসে আছে এবং প্রতিদিন মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞও চালাচ্ছে, তারপরও তারা অকপটে আজও একই মায়াকান্না করে যাচ্ছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের প্রতি বিদ্বেষ

আমরা পরোক্ষভাবে পূর্বে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছি যে, হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ভারতের সংবিধানকেও মেনে চলে না, জাতীয় পতাকাকেও মানে না, বরং তাদের দাবি হলো যে, তেরঙার পরিবর্তে ভাগওয়া ধ্বজকে (গেরুয়া রঙের পতাকা) জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করা হোক এবং সেক্যুলার সংবিধানকে বাতিল করে, মনুধর্ম শাস্ত্র অনুযায়ী সংবিধান রচনা করা হোক এবং ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা হোক।

তবে এর সাথে সাথে তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। গান্ধী ও নেহরুর কঠোর বিরোধী। চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, হিন্দুত্ববাদের দুই প্রধান চিন্তাবিদের নাম গান্ধীর হত্যাকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের সাথে তাদের দুজনেরই সম্পর্ক ছিল। আজকাল এই জাতীয়তাবাদীরা গডসেকে দেশভক্ত (জাতীয় নায়ক) হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, এবং গান্ধীর হত্যাকে এক মহান সাহসিকতার কাজ হিসেবে দাবি করছেন। এভাবে দেখার পর পাঠকই বলুন যে, যখন এই জাতীয়তাবাদীরা ভারতের সংবিধানকেও মেনে চলে না, তেরঙ্গা'র সম্মানও করে না, এবং স্বাধীন ভারতের দুই মহান নেতা- গান্ধী ও নেহরুর প্রতিও শ্রদ্ধা দেখায় না, তাহলে তো তাদেরকে দেশদ্রোহী বলা উচিত। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে আজ ক্ষমতার আসনে বসে আছে, আর সেই ভারতীয় মুসলমানরা যারা না ভারতের সংবিধান অস্বীকার করেন, না জাতীয় পতাকার প্রতি অসম্মান দেখান, এবং যারা গান্ধী ও নেহরুকেও সম্মান করেন, তাদেরকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দুত্ববাদ দর্শন অনুসরণকারী সংগঠনসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা (All–India Hindu Grand–Assembly)

হিন্দু মহাসভা জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিসেবে ছোট পরিসরে প্রথম হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন। হিন্দুত্ববাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সম্পর্ক ছিল এই সংগঠনের সঙ্গে এবং তিনি এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন।

এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রধান প্ররোচক ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, এবং ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ রাজের পক্ষ থেকে মর্লে-মিন্টো রিফর্মস (Morley-Minto Reforms), যার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য বিশেষ আসন বরাদ্দ করা হয়েছিল, এ সবই ছিল।

এই সমস্ত ঘটনার ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়। এর ফলে ১৯০৭ সালে যখন কংগ্রেসের সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেখানে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং কংগ্রেস সহিংস এবং মধ্যপন্থী দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। মধ্যপন্থী শিবিরের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে (Gopal Krishna Gokhale), আর সহিংস শিবিরের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক (Bal Gangadhar Tilak)। এবং তিলকের সঙ্গে সেই সময় পাঞ্জাব থেকে লালা লাজপত রায় এবং বঙ্গ থেকে বিপিন চন্দ্র পাল (Bipin Chandra Pal) সক্রিয় ছিলেন।

১৯০৯ সালে কংগ্রেসের এই কট্টর শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত নেতা- লালা লাজপত রায় এবং আর্য সমাজের[৩০] সাথে সম্পৃক্ত নেতা লাল চন্দ এবং শাদি লাল পাঞ্জাব হিন্দু সভা

[৩০] আর্য সমাজ একটি হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলন, যারা হিন্দু বেদসমূহের ভিত্তিতে মূল্যবোধ এবং আচার-আচরণ প্রচার করে। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিল দয়ানন্দ সরস্বতী। এই আন্দোলনের মতে, ঈশ্বর একজনই আছেন, যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর নাম ব্রহ্ম। হিন্দু বর্ণনার বিপরীতে এই আন্দোলন মূর্তিপূজার বিরোধী এবং নারী ও অন্যান্য জাতির লোকদেরকে হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ পাঠ করার অনুমতি দেয়। আর্য সমাজ গরুকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করে না। রামায়ণ ও মহাভারতকে পবিত্র গ্রন্থ বলেও মনে করে না। এবং সেখানে উল্লেখিত দেবদেবীদেরও তারা মানে না। তাদের মতে, পৃথিবীতে শুধুমাত্র বেদসমূহই ইলহামি গ্রন্থ এবং এর বাইরে কোনো গ্রন্থ ইলহামি নয়, যেমন কোরআন বা বাইবেল। এই ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি, এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম

প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা। মদন মোহন মালভিয়া ১৯০৯ সালের অক্টোবর মাসে লাহোরে এর প্রথম সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। পরবর্তীতে, পাঞ্জাবের মতো অন্যান্য প্রদেশেও আরও হিন্দু সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এপ্রিল ১৯১৫ সালে হরিদুয়ারে একটি মেলায় দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ একত্রিত হয়েছিল, যেখানে "সর্বদেশক হিন্দু সভা" (Sarvadeshak Hindu Sabha) নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় গান্ধী এবং আর্য সমাজের আরেক নেতা মণীশী রাম (স্বামী শ্রীধানন্দ) উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সর্বদেশক হিন্দু সভার প্রতিষ্ঠা পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। সভার সভাপতিত্ব করেন মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (Manindra Chandra Nandy), যিনি ঘোষণা করেন যে সভা ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য দেখাবে।

বাল গঙ্গাধর তিলকের জীবনকাল পর্যন্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিল এবং হিন্দু মহাসভার অবস্থান কংগ্রেসের একটি উপগোষ্ঠী ছিল। তবে ১৯২০ সালে দেশ বিভক্ত হওয়ার পর, জাতীয়তাবাদী এবং সেক্যুলার শ্রেণির মধ্যে ফাটল বৃদ্ধি পায় এবং এপ্রিল ১৯২১ সালে মহাসভা কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পরবর্তী সম্মেলনে, সংগঠনটি তার নাম পরিবর্তন করে "অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা" (Akhil Bhartiya Hindu Mahasabha) রাখে। এই সম্মেলনে সংগঠনের সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয় এবং ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের বাক্যটি সরিয়ে এর জায়গায় একটি ঐক্যবদ্ধ এবং স্বাধীন হিন্দু জাতির প্রতি আনুগত্যের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদিও হিন্দু মহাসভা প্রথমে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ছিল এবং হিন্দুত্ববাদের তত্ত্বও সে প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং প্রাথমিকভাবে এটি হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়ও ছিল। তবে খুব শীঘ্রই এটি হিন্দুদের মধ্যে, যদিও তারা জাতীয়তাবাদী হোক বা ধর্মনিরপেক্ষ, তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং এর প্রভাব ক্ষেত্র ১৯২০-এর দশক থেকেই খুব সীমিত হয়ে পড়ে। এর পেছনে নীচের কিছু কারণ কাজ করেছে-

বা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণকারী মানুষদের আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা এবং হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম বা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা রোধ করা।

আরএসএস এর প্রতিষ্ঠা

আরএসএস এর প্রতিষ্ঠা হিন্দু মহাসভার নেতাদের ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছিল। সেজন্য প্রথমদিকে আরএসএস এর প্রতি ধারণা ছিল যে, এটি মহাসভার ডানপন্থী শাখা। কিন্তু আরএসএস শীঘ্রই তার স্বাধীন অবস্থান প্রতিষ্ঠা করে এবং খুব দ্রুত হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মহাসভার স্থান দখল করে নেয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা

১৯২১ সালে যদিও মহাসভা তার সংবিধান থেকে ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের বিবৃতি মুছে ফেলেছিল, তবে বাস্তবে এই সংগঠন কখনও ব্রিটিশ রাজ থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন সমর্থন করেনি, এবং এতে কখনও অংশগ্রহণও করেনি। একইভাবে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস বহু সাধারণ মানুষ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছিল, কিন্তু মহাসভা সব সময়ই সেগুলোর থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিল।[৩১]

হিন্দু মহাসভা'র আরেকটি বিতর্কিত পদক্ষেপ ছিল ১৯৩৯ সালে সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেসের বিপরীতে মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট করা। এই দলটি সিন্ধ, সারহদ এবং বাংলা অঞ্চলে মুসলিমদের সঙ্গে মিত্র সরকারে অংশগ্রহণ করেছিল। মার্চ ১৯৪৩ সালে সিন্ধ সরকার ভারতীয় প্রদেশগুলোর মধ্যে প্রথম সরকার ছিল যা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাস করেছিল। এই সরকারের মধ্যে হিন্দু মহাসভার সদস্যরা মন্ত্রিপদে ছিলেন, তবে তারা তাদের মন্ত্রিপদ ত্যাগের পরিবর্তে শুধুমাত্র প্রতিবাদ রেকর্ড করিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন।

কংগ্রেস যখন 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' (Quit India Movement) শুরু করল, হিন্দু মহাসভার নেতারা তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করলেন। বরং তার নেতা

---

৩১ হিন্দু মহাসভার সাথে এমন কিছু নেতা অবশ্যই জড়িত ছিলেন, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। লালা লাজপত রায় তাদের মধ্যে একজন। কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। এরকমভাবে, ১৯২৮ সালে মহাসভা সংগঠনের নেতা হিসেবে পরিগণিত হওয়া মুনজে -এরও স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিল। তিনি যুবক বয়সে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। কিন্তু নেতা হওয়ার পর মুনজে -এর পক্ষ থেকে ব্রিটিশবিরোধী কোনো পদক্ষেপ পাওয়া যায়নি। সাভারকরও তার কারাবাসে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ত্যাগ করেছিলেন এবং লিখিতভাবে ব্রিটিশ সরকার প্রতি আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যা তিনি স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পালন করেন। সংক্ষেপে, হিন্দু মহাসভা সংগঠন হিসেবে কখনো ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ডে বা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়নি, বরং কার্যত তার বিপরীত কাজই দেখা গেছে।

সাভারকর এতটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি হিন্দু মহাসভার সদস্যদেরকে সারা ভারতজুড়ে মিশন চালানোর জন্য বলেন এবং বলেন যে, তারা যেন (সরকারি পদে) নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। তার থেকেও এগিয়ে, বাংলা অঞ্চলে হিন্দু মহাসভার নেতা সিয়ামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিনি সে সময় বাংলার সরকারে মিত্রপক্ষের সদস্য ছিলেন, ব্রিটিশ সরকারকে একটি চিঠি লিখে তার সংগঠন এবং বাংলার সরকারের প্রতি তার অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বলেন যে, বাংলার সরকার সব রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে এই আন্দোলন ব্যর্থ করা যায়, সাথে সাথে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে এই আন্দোলন ব্যর্থ করার জন্য পরামর্শও দেন।

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদ

আরেকটি বিষয় যা এর জনপ্রিয়তাকে প্রভাবিত করেছে তা হলো, এতে সবসময় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের আধিপত্য রয়েছে। এটি হিন্দুদের মধ্যে বর্ণব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য সংরক্ষিত আসন বা বিশেষ সুবিধা দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করে। মহাসভা ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে কল্পনা করে এবং "মনুস্মৃতি" (যাকে মনুধর্মশাস্ত্রও বলা হয়) ভারতের আইন হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এই আইনে হিন্দু বর্ণগুলোর জন্য তাদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ধরণের মতাদর্শের কারণে মহাসভার কার্যক্রম উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

গান্ধীর হত্যা

গান্ধীর হত্যাকাণ্ড হিন্দু মহাসভার ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। নাথুরাম গডসে এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি—যেমন দিগম্বর, গোপাল গডসে, নারায়ণ আপ্তে, বিষ্ণু কারকারে এবং মদনলাল পাহ্ব—হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। মহাসভার প্রধান নেতা সাভারকরকে এই হত্যার পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যদিও সাভারকরের সংশ্লিষ্টতার অনেক তথ্য-প্রমাণ ছিল, তবে তা প্রমাণ করতে না পারার কারণে তাকে এই অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীর হত্যাকাণ্ড হিন্দু মহাসভার প্রভাব ও ক্ষমতাকে পূর্বের চেয়েও বেশি সীমিত করে ফেলে। সারা দেশে মহাসভা এবং এর নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণার স্রোত বইতে শুরু করে। মহাসভার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং বাংলায় এর প্রধান শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি সংগঠনটি থেকে বিচ্ছিন্ন হন এবং আরএসএসের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে

ভারতীয় জনসংঘ গঠন করেন, যা পরবর্তীতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) হিসেবে পরিচিত হয়।

ইসলামের সাথে শত্রুতা

হিন্দু মহাসভা আজও টিকে আছে, তবে এর উপস্থিতি মূলত মহারাষ্ট্র রাজ্যেই সীমাবদ্ধ এবং অন্য রাজ্যগুলোতে এর কার্যক্রম প্রায় নেই বললেই চলে। তবে ইসলাম-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে এটি এখনো অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলছে। এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

এক. অযোধ্যায় বাবরি মসজিদকে রাম মন্দিরে রূপান্তরের আন্দোলনের সূত্রপাত মূলত মহাসভাই ১৯৪৯ সালে করেছিল। এরপর মহাসভার গুন্ডারা ১৯৪৯ সালে মসজিদের ভেতরে প্রতিমা স্থাপন করে, যার ফলে মসজিদটি বিতর্কিত ঘোষিত হয়ে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দুই. ২০১৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ক্ষমতায় আসার পর, হিন্দু মহাসভা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের চরিত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং তাকে একজন দেশপ্রেমিক নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করার প্রচার শুরু করে। হিন্দু মহাসভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অনুরোধ করে যে, নাথুরাম গডসের মূর্তি স্থাপন করা হোক। ২০১৫ সালের ৩০ জানুয়ারি, গডসের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে, হিন্দু মহাসভা "দেশভক্ত নাথুরাম গডসে" নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশ করে।

গডসের একটি মূর্তি নির্মাণ করে তাকে উৎসর্গ করে মন্দির গড়ার চেষ্টাও চলছে এবং দাবি করা হচ্ছে যে ৩০ জানুয়ারিকে "শৌর্য দিবস" (সাহসিকতার দিন) হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হোক। গান্ধীর প্রতি এই বিরোধিতা এবং তার হত্যাকারীকে নায়ক হিসেবে উপস্থাপনের প্রধান কারণ ছিল এটিই যে, গান্ধী মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং দেশভাগ মেনে নিয়েছিলেন।

তিন. ২০১৫ সালে হিন্দু মহাসভার সহ-সভাপতি সাধ্বী দেব ঠাকুর একটি বিতর্কিত বিবৃতি প্রদান করেন এবং সরকারকে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের বন্ধ্যাকরণের (জন্মনিয়ন্ত্রণ) প্রচার চালানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেনঃ

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এটির প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং মুসলমান ও খ্রিস্টানদের জোরপূর্বক

বন্ধ্যাকরণের অভিযান শুরু করতে হবে, যাতে তারা তাদের জনসংখ্যা বাড়াতে না পারে।[৩২]

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (National Volunteer Organisation)

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) হল হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে গঠিত ভারতের সবচেয়ে বড় সংগঠন এবং কর্মীদের সংখ্যার দিক থেকে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংগঠন। বর্তমানে সারা ভারতে, এবং বলা যায় যে, এটি বলা বাড়াবাড়ি হবে না যে, সারা বিশ্বে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, হিন্দুত্ববাদ এবং হিন্দু রাষ্ট্রের মতো স্লোগানগুলোর পতাকা এই সংগঠনই ধারণ করেছে। ভারতে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে 'গেরুয়া সন্ত্রাস' (Saffron Terrorism) এবং গণপিটুনির (Mob Lynching) ঘটনাসমূহ এই সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মীদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে।

আরএসএস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর শহরের ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। হিন্দু মহাসভার নেতা বালাকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে (Balakrishna Shivram Moonje) ছিলেন হেডগেওয়ারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। মুঞ্জে হেডগেওয়ারকে কলকাতায় মেডিকেল শিক্ষা নিতে এবং সেখানে বাঙালিদের গোপন বিপ্লবী সংগঠনগুলোর কাছ থেকে সংগ্রামের কৌশল শেখার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখানে হেডগেওয়ার ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী দল "অনুশীলন সমিতি" (Anushilan Samiti) -এর[৩৩] সদস্য হয়ে ওঠেন। এই সংগঠনগুলোর গোপন পদ্ধতিগুলো হেডগেওয়ার পরে আরএসএস গঠনের জন্য কাজে লাগান।

---

[৩২] হিন্দু মহাসভা-এর একজন নেতা ২০১৫ সালের ১২ এপ্রিল একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, যাতে তিনি মুসলিম ও খ্রিস্টানদের জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণের (forcibly sterilisation) আহ্বান জানান। এটি ভারতের ডেকান ক্রনিকল (Deccan Chronicle) নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

[৩৩] অনুশীলন সমিতি বাংলায় ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ব্রিটিশ রাজ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সামরিক ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে চেষ্টা করতে চেয়েছিল। এই সংগঠনের দুটি শাখা ছিল। ঢাকার শাখাটি অনুশীলন সমিতির নামে পরিচিত ছিল, এবং কলকাতার শাখাটি যুগান্তর (jugantar) নামে পরিচিত ছিল। বিখ্যাত হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু (Subhas Chandra Bose) এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এবং আরেক বিখ্যাত হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতার মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ (Aurobindo Ghosh) এবং তার ভাই বীরেন্দ্র ঘোষ (Barindra Ghosh) এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। এই সংগঠন ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে অনেক বোমা হামলা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের মাঝে বিদ্রোহের চেষ্টা করেছে, তবে সবগুলোই ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯২০ সালের পরে এই সংগঠনটি ভারতের রিপাবলিক পার্টি নামে পরিচিত হয়, যার অধীনে ১৯২৫ সালে কাকোরি গ্রামে রামপ্রসাদ বিসমিল, চন্দ্রশেখর আজাদ, আশফাক উল্লা খান এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা ট্রেন লুটে ব্রিটিশ রাজের কোষাগারের অর্থ নিয়ে পালানোর বিখ্যাত অপারেশনটি সম্পাদন করেছিলেন।

হেডগেওয়ার বাল গঙ্গাধর তিলকের (Bal Gangadhar Tilak) চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং ১৯১৮ সালে তিলকের স্বরাজ আন্দোলন (Home Rule Campaign)-এ সক্রিয় ছিল। ১৯২৩ সালে যখন সাভারকরের লেখা "হিন্দুত্বভা" বই প্রকাশিত হয়, তখন সেটি পড়ে হেডগেওয়ার খুবই প্রভাবিত হয়। ১৯২৫ সালে সে রত্নাগিরি কারাগারে সাভারকরের সঙ্গে দেখা করতেও যায়। সাভারকরের সঙ্গে দেখা করার পর এবং তার চিন্তাধারা পড়ার ফলে হেডগেওয়ার ধীরে ধীরে বিপ্লবী কার্যক্রম থেকে দূরে সরে যায়। বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিনায়ক দামোদর সাভারকরের রচনাগুলোর প্রভাবে হেডগেওয়ার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হিন্দুদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি হওয়া উচিত।

১৯২৫ সালে দশেরা উৎসবের সময় হেডগেওয়ার আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ)-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে তার সাথে উপস্থিত ছিলেন তার রাজনৈতিক গুরু এবং হিন্দু মহাসভার নেতা মুনজে, সাভারকরের বড় ভাই গণেশ সাভারকর, এবং আরএসএস-এ হেডগেওয়ারের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া কাশ্মীরমণ পরমজীও। মুনজে ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মহাসভার প্রধান ছিলেন, তবে ১৯২৫ সালে আরএসএস প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এর অভিভাবক এবং সহায়ক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি এবং গণেশ সাভারকর একসাথে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, দিল্লি এবং রাজবাড়িসমূহ (শাহী রাজ্য বা প্রিন্সলি স্টেট) সহ বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সংযোগের মাধ্যমে আরএসএস-এর শাখাগুলো বিস্তার করেছিলেন। সাভারকর পরবর্তীতে তার যুব সংগঠন "তরুণ হিন্দু সভা" ()Tarun Hindu Sabha আরএসএস-এর সাথে একীভূত করেন। এই কারণগুলোর ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার আরএসএস-কে হিন্দু মহাসভার একটি শাখা স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করত।

হেডগেওয়ারের এই ধারণাটি পছন্দ ছিল না, তাই ১৯৩৯ সালে তিনি পরবর্তী প্রধান সংঘচালক-এর জন্য গোলওয়ালকরকে নির্বাচন করেন, কারণ হেডগেওয়ারের মতে, গোলওয়ালকর সেই ক্ষমতা রাখতেন যে, তিনি এই সংগঠনের সম্পর্কে এমন একটি ধারণা বিলুপ্ত করতে পারবেন।

হেডগেওয়ার এই সংগঠনের নামের মধ্যে "রাষ্ট্রীয়" (National) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, যদিও এটি সম্পূর্ণভাবে একটি হিন্দু আন্দোলন ছিল। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা যে, শুধুমাত্র হিন্দুরাই ভারতের জাতি হতে পারে, তাই যখনই "রাষ্ট্রীয়" শব্দটি ব্যবহার হবে, তা থেকে উদ্দেশ্য হবে হিন্দু জাতি।

হেডগেওয়ার আরএসএস-এর জন্য বিপ্লবী মনোভাবসম্পন্ন হিন্দু তরুণদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তার পোশাক ছিল ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর ইউনিফর্মের মতো (কালো বিগার টুপি, খাকি শার্ট এবং খাকি হাফ প্যান্ট), এবং তাদের আধা-সেনা প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছিল, যাতে লাঠি, তলোয়ার, বর্শা এবং চাকু চালানো অন্তর্ভুক্ত ছিল। হেডগেওয়ার সাপ্তাহিক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত, যেখানে হিন্দুদের ইতিহাস এবং চরিত্রের বিষয়ে, বিশেষত মারাঠা সাম্রাজ্যের বিখ্যাত চতুর্পতি শিবাজির ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা হত। মারাঠা সাম্রাজ্যের পতাকা, ভাগওয়া ধ্বজ (গেরুয়া রঙের পতাকা) কে হেডগেওয়ার আরএসএস-এর প্রতীক এবং পতাকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

আরএসএস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুই বছর পর ১৯২৭ সালে হেডগেওয়ার অফিসারদের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল মূল কর্মীদের একটি দল তৈরি করা, যাদের তিনি 'প্রচারক' (মুবাল্লিগ) নামে অভিহিত করেছিলেন। এই প্রাথমিক প্রচারকদের কাজ ছিল যতটা সম্ভব শাখা প্রতিষ্ঠা করা। হেডগেওয়ার স্বেচ্ছাসেবকদের থেকে দাবি করতেন যে, তারা প্রথমে সাধু-সন্ন্যাসী হবে এবং সাংসারিক এবং পেশাগত জীবন ত্যাগ করে নিজেদের জীবনকে সংগঠনের কাজের জন্য উৎসর্গ করবে।

১৯২৭ সালে, যখন আরএসএস-এর স্বয়ং সেবক এর সংখ্যা ১০০ তে পৌঁছেছিল, তখন হেডগেওয়ার প্রথমবারের মতো এটি তার আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মুসলিম বিরোধিতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তারা হিন্দুদের একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের করে, যেখানে ঢোল বাজানো হচ্ছিল। সাধারণভাবে, এটি প্রচলিত ছিল যে মসজিদের সামনে থেকে সঙ্গীত বাজানো নিষিদ্ধ ছিল। তবে হেডগেওয়ার মুসলমানদের উত্তেজিত করতে মসজিদের সামনে থেকে ঢোল বাজিয়ে এই শোভাযাত্রা বের করেন। এই মসজিদটি ছিল নাগপুরের মহল এলাকার কাছে। মুসলমানরা শোভাযাত্রার পথ বন্ধ করলে সেখানে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষ তিন দিন ধরে চলেছিল, এবং পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য সরকারকে সেনা পাঠাতে হয়। তবে, আরএসএস-এর গুন্ডাদের কুকীর্তির কারণে, ওই এলাকার মুসলমানদের নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নাগপুর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। এই ঘটনার ফলে আরএসএস-এর স্বয়ং সেবকদের মনোবল খুব বেড়ে গিয়েছিল এবং এটি সংগঠনের মধ্যে একটি বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, যা সংগঠনটির বিস্তারেও সাহায্য করেছিল।

ব্রিটিশ রাজের বিরোধিতা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন থেকে বিরত থাকা

আরএসএস প্রতিষ্ঠার পর, হেডগেওয়ার এই সংগঠনকে ওই সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন ও কার্যক্রম থেকে দূরে রাখেন, যা ব্রিটিশ রাজের বিরোধী ছিল। হেডগেওয়ার আরএসএস-কে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে পরিচিত করিয়ে দেন এবং তিনি সর্বদা এটাকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের থেকে দূরে রেখেছেন। হেডগেওয়ার তার ভাষণ-বক্তৃতায় কেবলমাত্র হিন্দুদের সংগঠিত করার কথা বলতেন এবং সরকার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার থেকে বিরত থাকতেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে (অহিংস নাগরিক অসহযোগ আন্দোলন) হেডগেওয়ার ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ) কে আনুষ্ঠানিকভাবে এতে অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। তিনি সব জায়গায় এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, আরএসএস সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করবে না, তবে যারা ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতে চাইবে তাদের বাধা দেওয়া হবে না।

১৯৪০ সালে, গোলওয়ালকর আরএসএস-এর দ্বিতীয় প্রধান সংঘচালক হলেন, তখন তার চিন্তাধারা স্বাধীনতা আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে হেডগেওয়ারের চেয়েও বেশি কঠোর ছিল। তিনি সংগঠনকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে আরও কঠোরভাবে দূরে সরিয়ে দেন এবং হেডগেওয়ারের বিপরীতে ব্যক্তিগতভাবে এর মধ্যে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। তার মতে, আরএসএস-এর লক্ষ্য হল, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিবর্তে, হিন্দু ধর্ম এবং সভ্যতার রক্ষা করে স্বাধীনতা অর্জন করা।

গোলওয়ালকর প্রতিটি কাজ থেকে বিরত ছিলেন, যাতে ব্রিটিশ সরকার আরএসএসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোনো অজুহাত খুঁজে না পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, সরকার কর্তৃক আরোপিত সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তিনি পুরোপুরি মেনে চলেন, এমনকি নিজের সামরিক শাখা বন্ধ করার ঘোষণা পর্যন্ত দেন। এই আচরণের জন্য ব্রিটিশ সরকার তার প্রশংসা করে, কারণ আরএসএস কোনো ধরনের সাধারণ জনগণের অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেনি, ফলে তাদের অন্যান্য রাজনৈতিক কার্যক্রমে কোনও বাধা দেয়া হয়নি। মুম্বাই সরকার তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, আরএসএস সাবধানে নিজেদের আইনগত সীমার মধ্যে রেখেছিল এবং আগস্ট ১৯৪২ সালে (ভারত ছেড়ে যাওয়া আন্দোলনে) কোনওভাবে অংশগ্রহণ করতে বিরত ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আরএসএস কোনও ধরনের আদেশ অমান্য করেনি এবং সবসময় আইন মেনে চলতে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুম্বাই সরকার ডিসেম্বর ১৯৪০ সালে আরএসএসের প্রাদেশিক নেতাদের কাছে নির্দেশনা পাঠায় যে, তারা এমন কোনো কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকুক, যার দ্বারা সরকারকে অগ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে, এর উত্তরে আরএসএস ব্রিটিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয় যে, তাদের সরকারী আদেশ লঙ্ঘনের কোনও উদ্দেশ্য নেই।

এখানে এটি লক্ষ্যণীয় যে, হিন্দু মহাসভার মতো আরএসএসও ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করেনি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনভাবেই সহায়তা করেনি। তবে এই কার্যকলাপ, যেখানে হিন্দু মহাসভার সম্মান অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেখানেই আরএসএসের সম্মান কোনোভাবেই প্রভাবিত হয়নি, ব্যতিক্রম শুধু এটুকু যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় এই সংগঠন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, এটি একটি নিষ্ক্রিয় সংগঠন। এর প্রধান কারণ ছিল এই দুই সংগঠনের কৌশলগত পার্থক্য। হিন্দু মহাসভা শুধু ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেনি, বরং তার ভাষা ও কাজে স্পষ্টভাবে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন করেছে। আর ব্রিটিশ রাজ থেকে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের বিরোধিতা থেকে তো বিরত থাকেনি, বরং তা স্পষ্টভাবে তার কথা ও কাজের মাধ্যমে বিরোধিতা করেছে। এর বিপরীতে, আরএসএস কখনোই ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন বা বিরোধিতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেনি, তেমনি কখনোই স্বাধীনতা আন্দোলনকেও সমর্থন বা বিরোধিতা করেনি, বরং দুই পক্ষ থেকেই নিজেদের আলাদা রেখে চলেছিল।

এই দুই সংগঠনের ব্রিটিশ রাজের বিরোধিতা না করার মূল কারণ ছিল যে, তাদের দৃষ্টিতে মূল শত্রু মুসলিমরা ছিলেন এবং তাদের পুরো মনোযোগ হিন্দু জাতিকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একত্রিত করার দিকে কেন্দ্রীভূত করতে হতো। ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করলে এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হত, এবং সরকারের সন্তুষ্টি অর্জন করলে এই লক্ষ্য লাভবান হত। অন্যদিকে, স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিমরা অংশগ্রহণ করছিলেন এবং কংগ্রেস ও তার সঙ্গে সংযুক্ত হিন্দুরা মুসলিমদের সাথে সদয় মনোভাব বজায় রেখে তাদেরকে নিজেদের সাথে নিয়ে চলছিল, যা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের জন্য অসন্তোষজনক ছিল। সেজন্য হিন্দু মহাসভা তাদের আবেগ প্রকাশে সশব্দ হয়েছিল, যার পরিণতি তাদের ভোগ করতে হয়েছিল এবং এর ফলে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করার কারণে হিন্দুদের

মধ্যেই মহাসভার প্রতি বিরাগ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আরএসএস হিন্দু মহাসভার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবার পর, একই অভিজ্ঞতা পুনরাবৃত্তি করতে এড়িয়ে চলেছিল।

ফ্যাসিবাদী মনোভাব

হেডগেওয়ার এবং আরএসএস-এর অন্যান্য নেতারা ফ্যাসিবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তাই এই সংগঠনেও ফ্যাসিবাদী প্রভাব স্পষ্ট ছিল। সংগঠনের নেতারা খোলামেলা ভাবে হিটলার এবং তার ফ্যাসিবাদী নীতির সমর্থন করতেন। এর পাশাপাশি, গোলওয়ালকর যখন প্রধান সংঘচালক হলেন, তখন তিনি হিটলারের নীতিকে ভারতের জন্য আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেন, তবে তিনি ইসরায়েলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সমর্থনও প্রদান করেন এবং ইহুদিদের জাতীয়তাবাদকেও প্রশংসা করেন। ১৯৩৪ সালে হেডগেওয়ার ঘোষণা করেন যে, ফ্যাসিবাদী ভিত্তিতে সংগঠন গঠন করে হিন্দু সমাজকে যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এই সময়ে তিনি ফ্যাসিবাদ এবং মুসোলিনির বিষয় নিয়ে একটি সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। আরেকটি সম্মেলনে, যেখানে হিন্দু মহাসভার নেতা মুনজে উপস্থিত ছিলেন, আলোচনার বিষয় ছিল কিভাবে হিন্দু যোদ্ধাদের ইতালি এবং জার্মানির মতো ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের মতো সংগঠিত করা যায়।

১৯৩৩ সালের একটি ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে আরএসএস সম্পর্কে মন্তব্য ছিল:

এটা বলা হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না যে আরএসএস ভবিষ্যতে ভারতকে তেমন করতে চায় যেমনটি ইতালিতে ফ্যাসিবাদী এবং জার্মানিতে নাৎসি ছিল। গোলওয়ালকর হেডগেওয়ার-এর পথ অনুসরণ করে আরএসএসে ফ্যাসিবাদের ধারণাগুলো প্রচার করা শুরু হয়েছিল। তিনি খোলামেলা ভাবে জার্মানিতে নাৎসি মতবাদ এবং হিটলারের পদক্ষেপের প্রশংসা করতেন।

এই সম্পর্কে গোলওয়ালকর এর একটি উদ্ধৃতি আমরা গোলওয়ালকর এর চিন্তাধারার মধ্যে উল্লেখ করেছি, যা এখানে আবার উল্লেখ করছি:

নিজের জাতি এবং সংস্কৃতিকে বিশুদ্ধ রাখতে, জার্মানি সেমিটিক জাতি (অর্থাৎ ইহুদিদের)কে তার দেশ থেকে বহিষ্কার করে বিশ্বের সামনে একটি বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। এখানে জাতিগত অহঙ্কারের প্রকাশ নিজেদের শীর্ষে পৌঁছেছিল। জার্মানি আরও দেখিয়ে দিয়েছিল যে, যেসব জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে নিজস্ব ভেদাভেদ

বিদ্যমান, তাদের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ সত্ত্বা গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। এটি ভারতের জন্য শেখার এবং এতে উপকার পাওয়ার একটি ভালো পাঠ।[৩৪ ১]

ভারতের জাতীয় পতাকা তেরঙ্গার বিরোধিতা

আরএসএস তেরঙ্গাকে ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করেনি। এটি নিয়ে আরএসএসের সে সময়কার প্রধান গোলওয়ালকারের করা সমালোচনা তার চিন্তাধারার আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে। আরএসএসের পত্রিকা 'অর্গানাইজার' তার সম্পাদকীয়তে দাবি করেছিল যে, ভাগওয়া ধ্বজকেই ভারতীয় জাতীয় পতাকা হতে হবে। যখন ২২ জুলাই ১৯৪৭ সালে ভারতের সংবিধানসভা তেরঙ্গাকে ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে ঘোষণা করে, তখন অর্গানাইজার তা তীব্র সমালোচনা করে। তার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল,

"যারা ভাগ্যক্রমে ক্ষমতায় এসেছে, তারা আমাদের হাতে তেরঙ্গা তুলে দিয়েছে ঠিক, কিন্তু হিন্দুরা কখনোই এটিকে গ্রহণ করবে না, আর এর সম্মানও করবে না। তিন শব্দটিই নিজে থেকে খারাপ, এবং এমন একটি পতাকা যাতে তিনটি রঙ থাকে, তা অবশ্যই খারাপ মানসিক প্রভাব ফেলবে এবং দেশের জন্য তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।"

ভারতের সংবিধানের বিরোধিতা

আরএসএস ভারতের সংবিধানকেও স্বীকৃতি দেয়নি, এবং এই সংবিধান গঠনের ওপর কঠোর সমালোচনা করেছে, কারণ এতে কোথাও মনুর দেওয়া আইনগুলোর, যা মনুস্মৃতি (Mansuriti) থেকে নেওয়া হয়েছে, উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে গোলওয়ালকর তাঁর বইতে যে সমালোচনা করেছেন, তা তার চিন্তাধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। আরএসএস-এর পত্রিকা অর্গানাইজার ২০ নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখের একটি সম্পাদকীয়তে সংবিধান নিয়ে সমালোচনা করে লিখেছিল:

"কিন্তু আমাদের সংবিধানে প্রাচিন ভারতের সেই অতুলনীয় সাংবিধানিক অগ্রগতির কোনো উল্লেখ নেই। আজও মনুস্মৃতি-এ দেওয়া আইনগুলো পৃথিবীকে প্রশংসিত করে এবং স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ও আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আমাদের সাংবিধানিক পণ্ডিতদের জন্য এগুলোর কোনো মানে নেই।"ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ সালে "অর্গানাইজার" একটি আর্টিকেল প্রকাশ করে, যা আরও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে,

৩৪ ১ উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড (We or Our Nationhood Defined), এম. এস. গোলওয়ালকর, পৃষ্ঠা: ৮৭, ৮৮

আরএসএস ভারতীয় সংবিধানের পরিবর্তে মনুস্মৃতিকে আইন হিসেবে মানে। এতে লেখা ছিল:

যদিও বলা হয় যে সম্প্রতি ডক্টর আম্বেদকর মুম্বাইয়ে বলেছেন যে, মণুর দিন শেষ হয়ে গেছে, তবুও এটি একটি জীবন্ত সত্য যে, আজও হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবন মনুস্মৃতিতে দেওয়া নীতি ও আদেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এমনকি একজন স্বাধীন চিন্তাধারার ব্যক্তিও কিছু ক্ষেত্রে নিজেকে এই আইনগুলোর সাথে সম্পর্কিত মনে করে, যা মনুস্মৃতিতে দেওয়া হয়েছে। এবং সে সম্পূর্ণভাবে তার আনুগত্য ত্যাগ করার সাহস পায় না।

গান্ধীর হত্যাকাণ্ড এবং আরএসএস নিষেধাজ্ঞা

জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে যখন গান্ধী নিহত হন এবং এটি স্পষ্ট হয় যে, তার হত্যাকারী নাথুরাম গডসেও আরএসএসের সদস্য ছিলেন, তখন আরএসএসের অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে এই সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যদিও বিচারিক প্রক্রিয়ায় আরএসএসের গান্ধী হত্যায় কোনো ভূমিকা প্রমাণিত হয়নি, তবুও সরকার নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখে। গোলওয়ালকার তার মুক্তির পর, এই নিষেধাজ্ঞা উঠানোর জন্য জওহরলাল নেহরুকে একটি চিঠি লেখেন। নেহরু তার উত্তরে বলেন যে, এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভাই সর্দার প্যাটেলের কাজ। তবে তিনি এটাও মন্তব্য করেন যে, সরকারের কাছে প্রমাণ রয়েছে যে আরএসএসের কার্যক্রম যেহেতু গোষ্ঠীগত এবং সেগুলো জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। নেহরু প্রাদেশিক সরকারগুলোর নেতাদেরও একটি চিঠি পাঠিয়ে বলেন,

"আমাদের কাছে অনেক প্রমাণ রয়েছে যে আরএসএস একটি বেসরকারি বাহিনীর মতো সংগঠন এবং এটি একেবারে নাজিদের পথ অনুসরণ করছে।"

তখন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদও আরএসএসকে সমালোচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আরএসএস দিল্লি এবং অন্যান্য হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা উস্কে দেওয়ার, তাদের লুট করার, তাদের সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়ার এবং তাদের গণহত্যায় জড়িত ছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে একটি চিঠিতে রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখেছিলেন যে, আরএসএস পরিকল্পনা করেছিল যে মুসলিমদের ভয় দেখিয়ে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করা হবে এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালানো হবে, যাতে দুই পক্ষেই দাঙ্গা বাধে। তিনি প্যাটেলকে অনুরোধ করেছিলেন যে আরএসএসের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক, কারণ এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে শত্রুতা এবং ঘৃণা বাড়ানো। তিনি বলেছিলেন যে, আরএসএস হলো মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ

আন্দোলন, এবং এটি একটি গোপন আন্দোলন, যা সহিংসতা ব্যবহার করে এবং ফ্যাসিবাদ প্রচার করে এবং সোজা উপায় এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেয় না। তিনি চিঠিতে আরএসএসকে জনসাধারণের শান্তির জন্য একটি হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যখন গোলওয়ালকর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য চিঠি লেখেন, তখন তার উত্তরে প্যাটেল লিখেন যে, যদিও দেশভাগের সময় আরএসএস হিন্দুদের জন্য কিছু সেবা করেছে, তবে সেই প্রক্রিয়ায় তারা নিরপরাধ মুসলিম পুরুষ, নারী এবং শিশুদের উপর আক্রমণও করেছে। তিনি বলেছিলেন যে, আরএসএসের বক্তৃতা-বিবৃতি সাম্প্রদায়িক বিষে পূর্ণ, এবং এই বিষের কারণেই ভারত গান্ধীকে হারিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, আরএসএসের কর্মীরা গান্ধীর হত্যায় আনন্দ প্রকাশ করেছিল এবং মিষ্টি বিতরণ করেছিল। প্যাটেল সংগঠনের গোপন কার্যপ্রণালীতে আপত্তি জানান এবং এটি উল্লেখ করেন যে, সংগঠনের সমস্ত রাজ্য স্তরের নেতারা মারাঠা ব্রাহ্মণ। এর পাশাপাশি তিনি আরএসএসের ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজেদের একটি সামরিক বাহিনী রাখার বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, এটি অনুমোদনযোগ্য নয়, কারণ এটি ভারতের জন্য একটি সম্ভাব্য বিপদ হতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, আরএসএসের সদস্যরা দাবি করেন যে, তারা হিন্দু ধর্মের রক্ষক, তবে তাদের বুঝতে হবে যে হিন্দুধর্মের সুরক্ষা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মাধ্যমে সম্ভব নয়।

প্যাটেল আরএসএস-এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য একটি আবশ্যক শর্ত রাখেন যে, তারা একটি লিখিত সংবিধান তৈরি করবে এবং তা প্রকাশ করবে। এর মাধ্যমে আরএসএস ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেবে, তেরঙ্গাকে ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে স্বীকার করবে, সংগঠনের প্রধানের ক্ষমতা স্পষ্ট করবে, সংগঠনকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করবে এবং অভ্যন্তরীণ নির্বাচন পরিচালনা করবে, শিশুদের সংগঠনে যোগ দেওয়ার আগে অভিভাবকদের অনুমতি নেবে এবং গোপন পদ্ধতি ও সহিংস কার্যক্রম বন্ধ করবে।

এই দাবির বিরুদ্ধে গোলওয়ালকর একটি বৃহৎ প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু করেন, যার ফলে তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে আরএসএসের জন্য একটি সংবিধান প্রস্তুত করা হয়, যেখানে সংগঠনের প্রধান নির্বাচন করার পদ্ধতি এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের সদস্যপদ দেওয়ার জন্য পিতামাতার অনুমতির শর্ত মানা হয়নি, তবে বাকি সব শর্ত গ্রহণ করা হয়। তবে যে শর্তগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলির বাস্তবতা ছিল একটি বাতিল আইনের মতোই, যার উপর কখনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। না

অভ্যন্তরীণ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, না গোপন পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়েছিল, না সহিংস কার্যকলাপ বন্ধ করা হয়েছিল এবং না কখনও ভারতীয় সংবিধান বা তেরঙ্গাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এই ঘোষণা সহ যে, এই নিষেধাজ্ঞা গোলওয়ালকর-এর পক্ষ থেকে এই নিশ্চিতকরণের সাথে তুলে নেওয়া হয়েছে যে, তার সংগঠন ভারতীয় সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং ভারতের জাতীয় পতাকাকে গ্রহণ করবে এবং তার সম্মান করবে।

সংগঠনিক কাঠামো

যেহেতু হেডগেওয়ার আরএসএস-এর সাংগঠনিক পদ্ধতিটি বিপ্লবী আন্দোলনের স্টাইলে গঠন করেছিলেন, তাই এই সংগঠনে সদস্যপদ অর্জনের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ছিল না এবং এটি তার কর্মীদের কোনো অফিসিয়াল রেকর্ডও রাখত না। যে কোনো পুরুষ বা নারী যদি আরএসএস-এ যোগদান করতে চায়, তবে সে তার নিকটতম শাখার সাথে যুক্ত হতে পারতো। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে আরএসএস-এর কর্মীদের কোনো রেকর্ড নেই, তবে একটি অনুমান অনুযায়ী ২০১৫ সালে তার সদস্য সংখ্যা ষাট লক্ষেরও বেশি ছিল।

উর্দি/পোশাক

হেডগেওয়ার যখন আরএসএস প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তার স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য কালো ব্যাগার টুপি, খাকি শার্ট এবং খাকি হাফ প্যান্টকে ইউনিফর্ম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল। অপরদিকে এই একই পোশাক ব্রিটিশ রাজ পুলিশের ছিল। কিছু বছর পর খাকি শার্ট বদলে সাদা শার্ট ইউনিফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং আরএসএস তার প্রতিষ্ঠার ৯১ বছর পর ২০১৬ সালে খাকি হাফ প্যান্টকে ইউনিফর্ম থেকে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে খাকি প্যান্টকে ইউনিফর্মে অন্তর্ভুক্ত করে।

শাখা

শাখা দ্বারা আরএসএস-এর সবচেয়ে মৌলিক ইউনিটকে বোঝায়। এই শাখাগুলো প্রতিদিনের ভিত্তিতে কোনো পাবলিক স্থানে এক ঘণ্টা করে একত্রিত হয়। এই সমাবেশে শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যেমন ব্যায়াম ও খেলার মাধ্যমে, এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদ, হিন্দু সমাজের সেবা, এবং হিন্দুত্ববাদ এমন বিভিন্ন বিষয়েও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য বিশেষভাবে আধা-

সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তাদের ভারতীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের, বিশেষত মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করা যায়। আরএসএস-এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালে ভারতের সর্বত্র আরএসএস-এর ৮৪,৮৭৭ (আশি হাজার আটশ সাতত্রিশ) শাখা ছিল।

সংগঠনগত শ্রেণীবিভাগ এবং পদ

স্বয়ংসেবক (Smayamserak): এর মানে হলো স্বেচ্ছাসেবী। যে ব্যক্তি আরএসএসের শাখাগুলোর দৈনিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করে তাকে স্বয়ংসেবক বলা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আরএসএসের ইউনিফর্ম পরা আবশ্যক। বিজেপির অধিকাংশ নেতারা কমপক্ষে স্বল্প স্তরের স্বয়ংসেবক হিসেবে আরএসএসে যুক্ত ছিলেন। এমন বিখ্যাত নেতাদের মধ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং, সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, সাবেক রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু, সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এল কে আদভানি, এবং সাবেক মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত।

গটনায়ক (Gatananyak): শাখায় অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রুপ নেতা

কারিয়াওয়াহ (Karyamah): শাখার পরিচালক

মুখ্য শিক্ষক (Mulhay-Shikshalk): শাখার প্রধান এবং শিক্ষক

কার্যকর্তা (Karyakarta): আরএসএস-এর সক্রিয় কর্মীদের বলা হয়। কার্যকর্তা হওয়ার জন্য স্বয়ংসেবকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং শারীরিক প্রশিক্ষণের চারটি স্তর পার করতে হয়। এই কার্যকর্তাদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ গৃহস্থ কার্যকর্তা হয়ে থাকে, অর্থাৎ যারা পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবনযাপন করে। আর ৫ শতাংশ প্রচারক হয়ে থাকে যারা সম্পূর্ণভাবে আরএসএস-এর কাজের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে।

প্রচারক: আরএসএস-এর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারক। এই মানুষদের জন্য আরএসএস-এর কাজের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করা জরুরি। তারা বিবাহও করতে পারে, কোন ধরনের উপার্জনও করতে পারে, বরং তাদের পুরো মনোযোগ আরএসএস-এর কাজের উপরেই নিবদ্ধ থাকে। প্রচারকরা সংগঠনে মেরুদণ্ডের মতো গুরুত্বপূর্ন। আরএসএস-এর নিজেদের রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে প্রায় ২৫০০ জন প্রচারক রয়েছে।

বিচারক: এটি আরএসএসের চিন্তাবিদদের বলা হয়। আরএসএসে সংগঠনের চিন্তাধারা বিন্যাস এবং তার ব্যাখ্যা করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা নিযুক্ত হন। সংগঠনের নেতৃত্ব

চিন্তাধারা দেন না, বরং এই চিন্তাধারার ভিত্তিতে সংগঠন চালিত করেন। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে যদি সংগঠনের প্রচারক নিজে এগিয়ে গিয়ে সর্বোচ্চ নেতা প্রধান সংঘচালক হন। যেমন গোলওয়ালকর হয়েছেন।

সংঘচালক: রাজ্য স্তরের আরএসএস প্রধানদের বলা হয়।

প্রধান কার্যনির্বাহী: আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক (জেনারেল সেক্রেটারি) -কে বলা হয়। তাকে নির্বাচন করতে একটি কমিটি তৈরি হয়, যারা "অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি" হিসেবে পরিচিত।

প্রধান সংঘচালক: আরএসএসের সর্বোচ্চ নেতা বলা হয়। আরএসএসে পূর্ববর্তী প্রধান নতুন প্রধানকে মনোনীত করেন। হেডগেওয়ার আরএসএসের প্রথম প্রধান সংঘচালক, যিনি এম এস গোলওয়ালকরকে পরবর্তী প্রধান সংঘচালক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, এবং বর্তমানে প্রধান সংঘচালক হচ্ছেন মোহন ভাগবত।

সংঘ পরিবার (Sangh Parivar)

"সংঘ পরিবার" দ্বারা ওই সকল সংগঠন বা দলের পরিবারকে বোঝানো হয়, যারা হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই দলগুলোর শুরু হয় আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ) এর প্রচারকদের মাধ্যমে, অথবা যারা আরএসএস-এর আদর্শে বিশ্বাসী। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক, পেশাগত, ভাষাগত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংঘ পরিবার সম্পর্কিত অসংখ্য সংগঠন সক্রিয়।

এ ছাড়াও, নারীদের জন্য বিশেষ সংগঠন, শিশুদের জন্য সংগঠন, বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান (থিঙ্ক ট্যাঙ্ক), এবং গণমাধ্যম সংস্থাগুলোও সংঘ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া, শহর এবং গ্রাম স্তরে শত শত ছোট ছোট দল রয়েছে, যারা আরএসএস-এর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত, তারাও সংঘ পরিবারের অংশ।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত, আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ) সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের শত শত শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শক্তি ও প্রভাব আরএসএস উন্মুক্তভাবে ব্যবহার করেছিল দেশভাগের সময় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায়। তবে গান্ধীর হত্যার পর এবং তেরঙ্গা পতাকা ও ভারতীয় সংবিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোয় আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পরে আরএসএস বুঝতে পেরেছিল যে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে এবং তার সাথে সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য সমাজ-

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা অত্যাবশ্যক। তবে তাদের গোপন চরিত্র বজায় রাখার জন্য এবং সরকারের দমন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি জরুরি ছিল যে, এই প্রভাব আরএসএস সরাসরি তাদের নামে না ঘটায়। বরং এ উদ্দেশ্যে আলাদা সংগঠন গড়ে তোলা হয় এবং তাদের স্বাধীন মর্যাদা প্রদান করা হয়, যাতে কোনো সরকার যদি কোনো একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়, তাহলে সেই আইনি প্রভাব অন্য সংগঠনের ওপর না পড়ে।

স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আরএসএস-এর প্রচারকদের কাজ ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক শাখা প্রতিষ্ঠা করা। তবে স্বাধীনতার পর তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা কিছু প্রচারককে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত, কোনো একজন প্রচারককে একটি নির্দিষ্ট সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হতো।

স্বাধীন সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের কৌশলের ফলস্বরূপ, এক দশকের মধ্যেই সংঘ পরিবার এতটাই শক্তি অর্জন করল যে, ১৯৭৫ সালে যখন ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করলেন এবং আরএসএসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন, তখন এতে আরএসএসের কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়নি। সংঘ পরিবার সরকারের বিরুদ্ধে তাদের গোপন কার্যকলাপ বাড়িয়ে দিল, এবং দুই বছরের মধ্যেই জরুরি অবস্থার অবসান ঘটে এবং আরএসএসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও উঠে যায়। একইসাথে, সংঘ পরিবারের সমর্থিত জনতা দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সময়ের সাথে সাথে সংঘ পরিবারের শক্তি এবং প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং আজ এটি ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এটি সারা বিশ্বে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। এর রাজনৈতিক শাখা, ভারতীয় জনতা পার্টি, ২০১৪ সাল থেকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভারত শাসন করছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি (Bhartiya Janata Party – BJP)

ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি আরএসএস-এর রাজনৈতিক শাখা। ২০১৮ সাল থেকে এটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিধানসভায় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল। ২০২২ সালে বিজেপির একটি সরকারি বিবৃতির মতে, দলের নিবন্ধিত সদস্যের সংখ্যা ছিল ১৮ কোটি। এইভাবে, রাজনৈতিক কর্মীর সংখ্যার দিক থেকে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল।

সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস

স্বাধীনতার পরপরই, বিশেষ করে গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর আরএসএস-এর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে সদস্যদের মধ্যে এই দাবি বাড়ছিল যে আরএসএসের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত, যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা যায় এবং তাদের কাজ ও মতাদর্শকে আরও বিস্তৃত করা যায়। তবে আরএসএস যেহেতু একটি সামাজিক সংগঠনের পরিচয় তৈরি করেছিল এবং সরাসরি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা তাদের গোপন কৌশলের বিরোধী ছিল, তাই সেই সময়ের প্রধান সংঘচালক এম.এস. গোলওয়ালকর এই মতামতকে সমর্থন করেননি।

ভারতীয় জন সংঘ

এই সময়কালে হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি (Syama Prasad Mookerjee) মতপার্থক্যের কারণে মহাসভা থেকে আলাদা হয়ে যান এবং আরএসএস-এর (RSS) কাছাকাছি চলে আসেন। গোলওয়ালকর তাকে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরামর্শ দেন। সেই অনুযায়ী, গোলওয়ালকরের সমর্থন নিয়ে ১৯৫১ সালে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ভারতীয় জন সংঘ (Bhartiya Jana Sangh) প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের গঠনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা এবং কংগ্রেসের একটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিকল্প প্রদান করা।

আরএসএস এই দলকে শক্তিশালী করার এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রচারককে (প্রচারক) এই দলে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়। এর মধ্যে আরএসএস-এর বিখ্যাত প্রচারক দীন দয়াল উপাধ্যায়কে দলের সাধারণ সম্পাদক করা হয়, এবং দুই তরুণ প্রচারক অটল বিহারি বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদভানীকেও দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রথমদিকে এই দলটি ভারতে তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৫২ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলটি মাত্র ৩টি আসন জিততে সক্ষম হয়। ১৯৬৭ সালে দীন দয়াল উপাধ্যায় দলপ্রধান হন, তবে এক বছরের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। ১৯৬৮ সালে অটল বিহারি বাজপেয়ী ভারতীয় জন সংঘের নেতা হিসেবে নিযুক্ত হন।

এই সময়কালে দলের প্রধান রাজনৈতিক দাবি ছিল:

ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক ব্যক্তিগত আইন নয়, বরং একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা।

গরু জবাইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করে তার বিশেষ মর্যাদা বাতিল করা।

দলের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, তবে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা জারির আগ পর্যন্ত এই দলটি ভারতে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

জনতা পার্টি

১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসানের পর লোকসভা নির্বাচনে জন সংঘ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অন্যান্য দলের সাথে মিলে একটি জোট গঠন করে এবং নতুন দল তৈরি করে। জনতা পার্টি এই নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং প্রাক্তন জন সংঘ নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং অন্য নেতা লালকৃষ্ণ আদভানিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়।

১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ সালে জনতা পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত জন সংঘ সদস্যরা আলীগড় ও জামশেদপুরে সংঘটিত মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেন, যা জনতা পার্টির মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি করে। জনতা পার্টির অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ সদস্যরা দাবি করেন যে জন সংঘকে আরএসএস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, কিন্তু জন সংঘ তা প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে জনতা পার্টি ভেঙে যায়।

ভারতীয় জনতা পার্টি

১৯৮০ সালে জনতা পার্টির বিলুপ্তির পর, ভারতীয় জন সংঘের প্রাক্তন সদস্যরা সংঘ পরিবারের মতাদর্শের সাথে একমত কিছু অন্যান্য নেতাদের সাথে মিলে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রতিষ্ঠা করেন। যার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন অটল বিহারি বাজপেয়ী।

১৯৮০-এর দশকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথমে জনসংঘের বিরুদ্ধে রাজনীতিতে একটি মধ্যপন্থী অবস্থান গ্রহণের চেষ্টা করেছিল। তবে ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে তাদের মাত্র দুটি আসন লাভ হয়। এর পর, আদভানিকে তার মধ্যপন্থী মতাদর্শের কারণে পার্টির সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং তার পরিবর্তে লালকৃষ্ণ আদভানিকে দলের নতুন সভাপতি করা হয়। আদভানি দলকে তার মূলতত্ত্বের দিকে নিয়ে যান এবং তিনি অযোধ্যা-তে রাম জন্মভূমির সমস্যা উত্থাপন করেন এবং স্লোগান দেন যে, বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির তৈরি হবে।

এর ফলস্বরূপ ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি ৮৬টি আসন লাভ করেছিল এবং এটি জাতীয় ফ্রন্ট নামে একটি সরকারী জোটে যোগদান করেছিল, যার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভিপি সিং।

১৯৯০ সালে আদভানি "রথ যাত্রা" নামক এক কর্মসুচির মাধ্যমে সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রাম মন্দির আন্দোলনের সমর্থনে লক্ষ লক্ষ উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দু দাঙ্গাবাজদের নিয়ে একটি মিছিল শুরু করেন। এটি ছিল একটি সহিংস এবং মুসলিমবিরোধী মিছিল, এবং যেখান থেকেই এটি যেত, সেখানকার মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করত এবং তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করত। বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য আদভানিকে গৃহবন্দি করেন। যখন রথ যাত্রা অযোধ্যায় পৌঁছায়, অনেক হিন্দু জাতীয়তাবাদী দাঙ্গাবাজ মসজিদে আক্রমণ চালায়। তিন দিন ধরে তাদের সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চলে, যাতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। সংঘ পরিবারের সাথে সংযুক্ত সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরিকল্পনা নিয়েছিল, সে সমস্ত মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার ঘোষণা দেয় এবং উত্তর প্রদেশজুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু হয়। সরকারের পক্ষ থেকে রথ যাত্রায় সংঘ পরিবারের পথ রোধ করতে এবং হিন্দু গুন্ডাদের গ্রেফতার করার পদক্ষেপের জবাবে বিজেপি ভিপি সিংহের সরকার থেকে আলাদা হয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিজেপি আগের চেয়ে আরও বেশি, ১২০টি আসন পায় এবং যে উত্তর প্রদেশে এই ঘটনা ঘটেছিল, সেখানকার রাজ্যে বিজেপির নিজস্ব সরকার গঠিত হয়।

ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে সংঘ পরিবার এক লক্ষেরও বেশি গেরুয়া গুন্ডাকে একত্রিত করে এবং বাবরি মসজিদে আক্রমণ চালিয়ে তা ধ্বংস করে ফেলে। পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে দেশব্যাপী দাঙ্গা শুরু হয়, যেখানে প্রায় দুই হাজার মানুষ নিহত হয়, যার মধ্যে অধিকাংশই মুসলিম ছিল।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার ফলস্বরূপ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি লোকসভায় ১২১টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তারা সরকার গঠন করে। এরপর অটল বিহারি বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। কিন্তু লোকসভায় রাজনৈতিক চাপের কারণে এই সরকার ১৩ দিনেই শেষ হয়ে যায়।

১৯৯৬ সালে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলস্বরূপ একটি জোট সরকার গঠিত হয়, কিন্তু সেটি বেশি দিন টেকেনি। ১৯৯৮ সালে বিজেপি নতুন একটি জোট, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ), গঠন করে নির্বাচন উপলক্ষে। এনডিএ

নির্বাচনে অধিকাংশ আসন পেয়ে জয়ী হয় এবং অটল বিহারি বাজপেয়ী আবার প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৯৯ সালে একটি আঞ্চলিক দলের আলাদা হওয়ার ফলে এনডিএ জোট ভেঙে যায় এবং পুনরায় নির্বাচন করতে হয়। তবে এইবার এনডিএ আগের তুলনায় আরও বেশি আসন পায় এবং লোকসভায় ৩০৩টি আসন নিয়ে সাদামাটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এর মধ্যে বিজেপি পায় তার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ১৮৩টি আসন। অটল বিহারি বাজপেয়ী তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন এবং এল কে আদভানি তাঁর উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন। এই সরকার পাঁচ বছর পূর্ণ করে। ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জরুরি অবস্থা জারি করার পর থেকে ২৫ বছর পর এটি ছিল প্রথম সরকার, যা তার মেয়াদ পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এবং ভারতীয় রাজনৈতিক দৃশ্যপট দুটি চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে— ধর্মনিরপেক্ষতা এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদ।

এই সরকারী শাসনের অধীনে ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে গুজরাটে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এই দাঙ্গাগুলি বিজেপির পক্ষ থেকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইঙ্গিতে করা হয় এবং দাঙ্গাকারীরা ভগওয়া দলের দ্বারা পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতা লাভ করেছিল রাজ্য পুলিশ থেকে। এই দাঙ্গায় প্রায় দুই হাজার মুসলমান শহীদ হন এবং প্রায় দেড় লাখ মুসলমান তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

২০০৪ সালে আবার নির্বাচন হয় এবং বিজেপি পরাজিত হয়। এর পর পরবর্তী দশ বছর BJP বিরোধী দলে ছিল। এই দশ বছরে সংঘ পরিবার তাদের দুর্বলতা দূর করার উপর মনোযোগ দেয় এবং উঁচু জাতির হিন্দুদের পাশাপাশি দলিতদেরও হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্লোগানে তাদের সাথে যুক্ত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। এছাড়া, এই সময়ে সংঘ পরিবার গ্রামীণ এলাকাগুলোতে এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে তাদের মনোযোগও বৃদ্ধি করে।

এই দশ বছরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ২০১৪ সালের নির্বাচনে এনডিএ ৫৪৩টি লোকসভার আসনের মধ্যে ৩৩৬টি আসন লাভ করে, যার মধ্যে ২৮৪টি আসন ছিল বিজেপির। ১৯৮৪ সালের পর এটি প্রথমবার ছিল যে, একক একটি দল লোকসভায় সোজা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। এবং এটি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার ছিল, যে কোনো রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র তার নিজস্ব শক্তির উপর ভিত্তি করে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি আবার বিজয়ী হয় এবং সেই সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিজেপি ভারতজুড়ে সরকার পরিচালনা করছে।

বিজেপির রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ

বিজেপি তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে হিন্দু জাতির সত্তাকে তার রাজনীতির মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে তারা তাদের নিচের লক্ষ্যগুলো স্থির করেছে:

এক. বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণ,

দুই. কাশীতে জ্ঞানবাপী মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণ,

তিন. মথুরায় শাহী ঈদগাহ মসজিদকে ভেঙে সেখানে থাকা মন্দিরের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা,

চার. গবাদি পশু জবাইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা,

পাঁচ. আর্টিকেল ৩৭০ বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করা,

ছয়. ভারতের ইতিহাসকে পুনর্লিখন করা, এবং এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাগত পাঠ্যক্রমেও পরিবর্তন আনা,

সাত. তেরঙ্গার পরিবর্তে ভাগওয়া ধ্বজকে ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করা।

এই লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ৯০-এর দশকের শুরুতেই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল। ২০১৯ সালে বিজেপি সরকারের পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর আর্টিকেল ৩৭০ বাতিল করা হয়। এখন মথুরা এবং কাশিতে মসজিদগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাজ চলছে। বিভিন্ন রাজ্যে একক নাগরিক কোড প্রবর্তনের জন্য আইন তৈরি করা হচ্ছে। ভারতের ইতিহাসকে একক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ঢালাই করার জন্য ২০১৪ সালের পর থেকে সরকারি পর্যায়ে কাজ চলছে। ২০২২ সালে পাঠ্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো মুঘল যুগের ইতিহাস পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গরু হত্যার ওপর সরকারি পর্যায়ে যদিও এখনও একটি বা দুটি রাজ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সম্ভব হয়েছে, তবে বেসরকারি পর্যায়ে পুরো দেশে তা কার্যকর হয়ে গেছে। যেখানে কখনো জানা যায় যে, কেউ গরু হত্যা করেছে, সেখানে গেরুয়া সন্ত্রাসীরা এসে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের ওপর সহিংসতা চালায়। একই সঙ্গে, গেরুয়া পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছে।

এই সব লক্ষ্য মূলত সংঘ পরিবারে'র মৌলিক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াসে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।

বিজেপির সাফল্যের কারণ

ধর্মীয় কার্ডের ব্যবহার

ভারতে ৮০ শতাংশ জনগণ হিন্দু, যেখানে বাকি ২০ শতাংশ জনগণ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। কিন্তু এই হিন্দু জনগণ বিভিন্ন জাতি এবং শ্রেণিতে গভীরভাবে বিভক্ত। প্রতিটি জাতি এবং শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য আলাদা আলাদা রাজনৈতিক দল ছিল, এবং তাদের আনুগত্যও বিভিন্ন প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভক্ত ছিল। বিজেপির সাফল্য ছিল যে, তারা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য হিন্দু জনগণের মধ্যে জাতি এবং শ্রেণীর বিভেদকে কাজে লাগিয়েছে এবং সবাইকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্ববাদের ধারণায় একত্রিত করেছে। বিজেপি ৮০ শতাংশের বিরুদ্ধে ২০ শতাংশ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার রক্ষা, হিন্দু রাষ্ট্র এবং 'রাম রাজ্য' এর মতো স্লোগান দিয়ে হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণীকে একত্রিত করেছে। এমনকি হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত এবং নিচু শ্রেণীর মানুষও, তাদের উপর হওয়া সব অপমানের পরেও, আনন্দের সাথে বলেছে যে, যাঁরা রামকে ফিরিয়ে আনবেন, আমরা তাঁদেরকেই সমর্থন করব এবং বিজেপিকে ভোট দেব।

মুসলিম ধ্বংসনীতি

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণাকে উস্কে দেওয়া বিজেপির জয়ী হওয়ার প্রধান কারণ। বিজেপি তাদের প্রতিষ্ঠার পর প্রথম জোট সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল, যখন তারা রাম জনমভূমি আন্দোলন শুরু করেছিল এবং বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের আহ্বান জানায়।

১৯৯০ সালে আদভানির রথযাত্রা বিজেপির এক নতুন রূপ তৈরি করে। এই রথযাত্রার ফলস্বরূপ বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার পরপরই উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক বছর পর বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ করে।

২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার ফলে নরেন্দ্র মোদী হিন্দুদের মধ্যে এক নায়কের পরিচিতি লাভ করেন। এবং মুসলিম-বিরোধী এই খ্যাতিকে মোদী ২০১৪ সালের নির্বাচনে ব্যবহার করে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেন। এরপরেও, ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচন হোক কিংবা ২০২২ সালের রাজ্য নির্বাচন, মুসলিম বিদ্বেষ এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণার অনুভূতি উস্কে দেওয়া ছিল বিজেপির সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ।

মোদীর পর এখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও তার মুসলিম বিরোধী অবস্থান কারণে খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছেন। যেমন গুজরাট দাঙ্গাগুলো মোদীকে নায়ক বানিয়েছিল, তেমনি উত্তর প্রদেশে মুসলিম বিরোধী পদক্ষেপগুলো যোগী আদিত্যনাথকে নায়ক বানাচ্ছে এবং বলা হয় যে মোদীর পর বিজেপিতে সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি যোগী আদিত্যনাথই।

ঘরে ঘরে পৌঁছানো

বিজেপির সফলতার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো তার যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিজেপি একক দল নয়, বরং একটি বৃহৎ সিস্টেম, অর্থাৎ সংঘ পরিবারের অংশ, যার নেতৃত্ব আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ) পরিচালনা করে। আরএসএসের প্রচারকরা না তো বিয়ে করেন, না কোনো আয় উপার্জন করেন, বরং তাদের পুরো জীবন আরএসএসের কাজের জন্য উৎসর্গ করে দেন। নির্বাচনকালীন সময়ে বিজেপির সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে এই প্রচারকরা এবং আরএসএসের সমস্ত কর্মী এবং সেবককে সক্রিয় রাখে। আর সংঘ পরিবারের অন্যান্য সংগঠনগুলো যেহেতু সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত, তাই এগুলোও নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজে বিজেপির সহায়ক হয়। এইভাবে আরএসএসের শাখার ব্যবস্থা এতই সুশৃঙ্খল যে এর কর্মী এবং স্বয়ংসেবকরা প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারের কাছে সরাসরি পৌঁছাতে সক্ষম। এই পুরো নেটওয়ার্কের সাহায্যে, যেখানে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং ইসলাম বিদ্বেষের পক্ষে হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীকে একত্রিত করা হয়, সেখানে গরিব এবং নিম্নবর্গের হিন্দুদের মধ্যে নির্বাচনকালীন সময়ে বিনামূল্যে রেশন এবং টাকা বিতরণ করে তাদের ভোট নিশ্চিত করা হয়।

বিজেপির শক্তি এবং প্রভাবের কারণসমূহ

আরএসএস এবং সংঘ পরিবারে সংযুক্তি বিজেপির শক্তি এবং দৃঢ়তার মূল কারণ। কংগ্রেসের বিপরীতে, এটি একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজনৈতিক দল নয়, বরং একটি মতাদর্শ এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক একটি পরিবারের অংশ। তাই যেখানে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোতে গোষ্ঠীবদ্ধতা থাকে এবং দলগুলো ভেঙে অনেক দলে ভাগ হয়ে যায়, সেখানে বিজেপির প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত এই দলে কোনো গোষ্ঠীবদ্ধতা বা অস্থিরতা দেখা যায়নি। কারণ বিজেপির অস্তিত্ব একটাই মূল বিষয়ে কেন্দ্রীভূত, এবং সেটি হলো আরএসএস এবং সংঘ পরিবারের প্রতি আনুগত্য। যে কেউ এতে যোগ

দেবে, সে গোষ্ঠাবদ্ধতা করবে না, আর যে কেউ এর থেকে সরে যাবে, সে শুধু তার মর্যাদা এবং স্থান হারাবে না, বরং সংঘ পরিবারের শত্রুতা নিয়ে সে নিজের জীবন এবং সম্পদকেও বিপদের মধ্যে ফেলে দেবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (Vishva Hindu Parishad)

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (World Hindu Council) বা নতুন আঞ্চলিক পরিভাষায় (VHP) সংঘ পরিবারের সাথে সম্পর্কিত একটি চরমপন্থী এবং আক্রমণাত্মক সংগঠন। এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা থেকে এখন পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় সংঘ পরিবার দ্বারা এই সংগঠনের তহবিল এবং সহিংসতায় জড়িত হওয়ার প্রমাণ দেখা গেছে। তা সে বাবরি মসজিদের ধ্বংসকরণ হোক বা গুজরাট দাঙ্গা অথবা এমন অন্যান্য দাঙ্গা অথবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হামলার ঘটনা হোক, মূল ভূমিকা পালন করে এই সংগঠন এবং এর যুব শাখা বজরং দলের গুন্ডারা।

"ভি.এইচ.পি." (VHP), বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এবং স্থানীয় আদিবাসী ধর্মগুলোকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে মনে করে। "ভি.এইচ.পি." প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালের ২৯ আগস্ট মুম্বাইয়ে একটি সম্মেলনে। এই সম্মেলনের আয়োজন করছিলেন আর.এস.এস. প্রধান এম.এস. গোলওয়ালকার। হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের অনেক প্রতিনিধির পাশাপাশি তিব্বতের বৌদ্ধদের প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা দালাইলামা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাই দালাইলামাকে ভি.এইচ.পি.-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। গোলওয়ালকার এই সম্মেলনে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একত্রিত হওয়া প্রয়োজন এবং 'হিন্দু' শব্দটি সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর প্রযোজ্য। আর.এস.এস.-এর এক প্রচারক এস.এস. আপ্টে তার ভাষণে বলেছিলেন:

"এখন খ্রিষ্টান, মুসলমান এবং সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বিভেদ রয়েছে। তারা সকলেই হিন্দু সমাজকে একটি ভালো এবং সুস্বাদু খাবারের মতো খাচ্ছে, যার উপর তারা আক্রমণ করে নিজেদের মোটা করছে। এই সংঘর্ষের যুগে এখন প্রয়োজন যে হিন্দু বিশ্ব সম্পর্কে চিন্তা করা হোক এবং তাকে সংগঠিত করা হোক, যেন তা এই তিনটি শক্তির ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।"[৩৫]

এই সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন হিন্দুদের আধ্যাত্মিক নেতা চিন্ময়ানন্দ সরস্বতী। অন্যান্য প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের মধ্যে

[৩৫] হিন্দুইজম অ্যান্ড মডার্নিটি (Hinduism and Modernity) (২০০৩) - ডেভিড জেমস স্মিথ, পৃষ্ঠা: ১৮৯

ছিলেন খ্যাতনামা শিখ নেতা মাস্টার তারা সিং,[৩৬] 'নামধারী'[৩৭] শিখ নেতা গুরু জগজিৎ সিং এবং কংগ্রেসের প্রখ্যাত নেতা রাম প্রাসাদ স্বামী লেয়ার।

এই সম্মেলনে সংগঠনের নাম হিসেবে 'হিন্দু মহাসভা' নির্বাচন করা হয়। চিন্ময়ানন্দ সরস্বতীকে এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত করা হয়, এবং এস. এস. আপনে-কে এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এই সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করার জন্য ১৯২৬ সালে এলাহাবাদে কুম্ভ মেলার সময় একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই সংগঠনটি হিন্দু গুরুদের ধর্মীয় সমাবেশ 'ধর্ম সংসদ' থেকে সরাসরি নির্দেশনা গ্রহণ করে। এসব ধর্ম সংসদে হিন্দুদের জন্য নির্দেশনা এবং ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণ করা হয়। ডিসেম্বর ২০২১ সালে হরিদুয়ারে অনুষ্ঠিত হওয়া ধর্ম সভায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার এবং তাদের গণহত্যা করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

ভিএইচপি (বিশ্ব হিন্দু পরিষদ) দাবি করছে যে তার সদস্যসংখ্যা ৬৮ লাখের বেশি। একই সঙ্গে, ভারতের বাইরে ২৯টি দেশে তার শাখা রয়েছে।

উদ্দেশ্য ও মৌলিক কাজ

ভিএইচপি তাদের সরকারি ভাবে উদ্দেশ্য হিসেবে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা এবং হিন্দু ধর্মের সেবা ও রক্ষা করা বলে দাবি করে। এর পাশাপাশি ভিএইচপি পুরো বিশ্বে হিন্দুদের এবং তাদের অধিকার রক্ষাকে তাদের উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করে। এই সংগঠনের মৌলিক কাজ ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

এক. হিন্দু মন্দিরের নির্মাণ ও উন্নয়ন।

দুই. এমন মসজিদ এবং অন্যান্য উপাসনালয়ের চিহ্নিত করা যেখানে আগে মন্দির ছিল, এবং সেখানে আবার মন্দির নির্মাণের আন্দোলন শুরু করা।

তিন. গরু জবাই করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং গোহত্যা বন্ধ করতে সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো।

[৩৬] মাস্টার তারা সিং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন প্রখ্যাত শিখ নেতা ছিলেন। মূলত ভারত ভাগের সময় ভারত ও পাকিস্তানে পালিয়ে আসা মুসলমানদের গণহত্যা করানোর জন্য তার খ্যাতি, বা অন্য কথায় কুখ্যাতি রয়েছে।

[৩৭] নামধারী নামে শিখদের একটি গোষ্ঠী আছে। এই গোষ্ঠীর বিশ্বাস হল যে, ঈশ্বরের নাম মুখে মুখে জিকির করা ছাড়া আর কোনো রকম উপাসনার প্রয়োজন নেই। এজন্য তারা "নামধারী" নামে পরিচিত। এছাড়াও তাদের "কুকে" নামেও ডাকা হয়, যা পাঞ্জাবি শব্দ "কোক" থেকে উদ্ভূত, যার মানে হল "চিৎকার"। এই নাম তাদের এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে তারা তাদের স্মরণ সভায় স্মরণকালে একসাথে "চিখ" শব্দটি উচ্চারণ করে।

চার. হিন্দুদের ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করা এবং যারা মুসলিম বা খ্রিষ্টান হয়ে গেছেন তাদেরকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা।

ধর্মান্তরণ সম্পর্কিত পদাক্ষেপ

ভিএইচপি (বিশ্ব হিন্দু পরিষদ)-এর সদস্যরা এমন হিন্দুদের চিহ্নিত করতে সচেষ্ট থাকেন, যাদের সম্পর্কে সন্দেহ থাকে যে তারা ধর্মান্তরিত হতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে সংগঠনটি বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছে, যাকে "ধর্ম প্রসার বিভাগ" বা ধর্মীয় প্রচারের ইউনিট বলা হয়। এই ইউনিটের কাজ হলো এমন মানুষদের চিহ্নিত করা, যাদের সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে, তারা মুসলিম বা খ্রিষ্টান হয়ে যাবে। এই ইউনিট প্রথমে তাদের ধর্ম না ছাড়ার জন্য রাজি করার চেষ্টা করে এবং যদি তারা রাজি না হন, তবে তাদের উপর চাপ প্রয়োগ, ভয়-ভীতি বা হুমকির মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করে। হিন্দু সমাজে, বিশেষত দলিতরা যেহেতু সবচেয়ে দুর্বল অবস্থানে থাকে, সেহেতু তারা সবচেয়ে বেশি ধর্মান্তরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দলিতদের বিষয়ে এই ইউনিটের পদ্ধতি হলো, যদি তারা তাদের ধর্ম ত্যাগে অনড় থাকে, তবে তাদের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি করানো হয়, কিন্তু তাদের মুসলিম বা খ্রিষ্টান হতে দেওয়া হয় না।

এছাড়া ভিএইচপি "ঘর ওয়াপসি" নামক একটি ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য হল তাদের পুরনো ধর্মে ফিরিয়ে আনা যারা তাদের ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এতে মূলত খ্রিস্টানদের ফিরে আসার সংখ্যা অনেক বেশি, তবে মুসলমানদেরও একটি ক্ষুদ্র সংখ্যা থাকে। এই সংগঠন তাদের কার্যক্রমের নিয়মিত রিপোর্টও প্রকাশ করে। ভিএইচপি এর দাবি অনুযায়ী, ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে এটি ২৬,০০০ জনকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে এনেছে। একইভাবে ২০০২ সালে ১৫,০০০ জনকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ২০০৪ সালে ১২,৮৫৭ জনকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়, এর মধ্যে ৩,৭২৭ জন মুসলমান এবং ১৩০,৯০ জন খ্রিস্টান ছিল।

বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ প্রতিরোধ এবং ঘর ওয়াপসি আন্দোলনের জন্য ভিএইচপি (বিশ্ব হিন্দু পরিষদ) কিছু উপ-সংগঠনও গঠন করেছে। এই উপ-সংগঠনগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হলো 'হিন্দু জাগরণ', যেখানে বিভিন্ন রাজ্যে ছোট আকারে এ ধরনের আরও উপ-সংগঠনও রয়েছে। ২০১৪ সালে বিজেপির সরকার গঠনের পর থেকে এই সমস্ত সংগঠন গেরুয়া আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরের আন্দোলন

নিজের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মসজিদ ভাঙার এবং সেগুলোকে মন্দিরে রূপান্তর করার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসে এর মূল ভূমিকা ছিল। ১৯৮৪ সালে ভিএইচপি রাম জন্মভূমি আন্দোলন শুরু করে এবং দাবি করে যে ১৬শ শতকে মুঘল সম্রাট বাবর রাম জন্মভূমিতে নির্মিত মন্দিরটি ভেঙে সেখানে বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় ১৯৯০ সালে আদভানি যে যাত্রা শুরু করেন, তাতে ভিএইচপি'র অনেক সদস্য ছিল যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য দায়ী। এবং ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার জন্য মূলত বাঙ্গালির গুন্ডাদেরই বড় ভূমিকা ছিল।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পর, সেখানে দাঁড়িয়ে ভিএইচপি-র গুন্ডারা স্লোগান দিয়েছিল, "এটা তো মাত্র শুরু, কাশী-মথুরা এখনো বাকি আছে।" এর মানে ছিল কাশী (বনারস)-এ জ্ঞানবাপী মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করা এবং মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)-এ শাহি ঈদগাহ মসজিদকে ধ্বংস করে মন্দিরে পরিণত করা।

২০১৯ সালে বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আরও অনেক মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করার আন্দোলন শক্তি পেয়েছে। এ বিষয়ে ভিএইচপি আইনকেও আশ্রয় করছে এবং জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ তৈরির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বজরং দল (Bajrang Dal)

বজরং দল (হনুমান[৩৮] বাহিনী) বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব শাখা। এর প্রতিষ্ঠা উত্তর প্রদেশে হয়েছিল, এরপর এটি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়। এরও আরএসএস-এর মতো অনেক শাখা রয়েছে, যেগুলিকে আখড়া বলা হয়। বজরং দলের ভারতে মোট ১২,৫০০টি আখড়া রয়েছে। বজরং দলের প্রতিষ্ঠা অক্টোবর ১৯৮৪ সালে হয়, যখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাম জন্মভূমি আন্দোলন পরিচালনা করছিল। এই আন্দোলনের সময়, ভিএইচপি প্রতিদিন মিছিল বের করছিল, যাতে হিন্দুদের উদ্দীপ্ত করতে সম্প্রদায়িক ও উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়া হতো। এই উস্কানিমূলক ভাষণের কারণে সম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং দাঙ্গার আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছিল। এই আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই যুব শাখাটি প্রতিষ্ঠা করে, যাতে ঐই মিছিলে নিরাপত্তা প্রদান করা যায়। পরবর্তী বছরগুলোতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এই সংগঠনের নিয়মিত কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

[৩৮] হনুমান হিন্দুদের বানর আকৃতির দেবতা। উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে তাকে বজরংবলীও বলা হয়।

বজরং দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বজরং দল তার উদ্দেশ্য হিসেবে "ভারতের হিন্দু পরিচিতিকে কমিউনিজম, মুসলমানদের বাড়তি জনসংখ্যা এবং খ্রিস্টানদের ধর্মান্তকরণের মিশনের বিপদ থেকে রক্ষা" দাবি করে। এছাড়াও, বজরং দলের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

এক. অযোধ্যায় রাম মন্দিরের নির্মাণ

দুই. মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদের জায়গায় কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির

তিন. বারাণসীতে জ্ঞানবাপী মসজিদের জায়গায় কাশী বিশ্বনাথ মন্দির

চার. গোহত্যা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ

দাঙ্গায় ভূমিকা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ভারতেও মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে হওয়া সমস্ত দাঙ্গায় এই সংগঠনগুলি জড়িত থাকে। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে শুরু করা দাঙ্গা এবং তাদের বিরুদ্ধে চালানো অভিযানের তালিকা অনেক দীর্ঘ। ২০১৯ সালে বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো নতুন ঘটনাটি ঘটে, অথবা এই সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো নতুন অভিযান শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যে কিছু নির্বাচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে-

এক. ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদের ধ্বংসে বজরং দলের দুষ্কৃতিকারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

দুই. ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় মুসলিমদের হত্যা, মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানি এবং মুসলিম সম্পত্তি ধ্বংসের কাজও বজরং দলের গুন্ডারা করেছে।

তিন. বজরং দল ২০০৩ সালে মহারাষ্ট্রের শহর পুরবাইয়ে একটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এপ্রিল ২০০৬ সালে দুই বজরং দল সদস্য মহারাষ্ট্রের শহর নন্দড়ে বোমা তৈরি করতে গিয়ে মারা যায়। মৃত গুন্ডাদের কাছে বেশ কয়েকটি মসজিদের নকশা পাওয়া যায়, যেখানে বোমা হামলা করার পরিকল্পনা ছিল।

চার. বজরং দল গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য জমি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। যারা মুসলমানদের জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট বিক্রি করবে, বজরং দলের গুণ্ডারা তাদেরকেও সহিংসতার শিকার করে, সেই মুসলমানের বাড়িতে

আক্রমণ করে এবং তাকে বাধ্য করে যে সে তার বাড়ি বিক্রি করে সেখান থেকে চলে যাবে।

পাঁচ. সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে বজরং দলের গুণ্ডারা কর্ণাটকে অনেক খ্রিস্টান গির্জা এবং উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়, এই অভিযোগে যে তারা হিন্দু দেবতাদের অবমাননা করে এবং হিন্দুদের খ্রিস্টান বানানোর কাজ করছে। একই সময়ে, বজরং দলের গুণ্ডারা কর্ণাটক এবং ওড়িশায় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাতেও জড়িত ছিল।

ছয়. ২০১৫ সাল থেকে বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ "গোরক্ষা" (গরু হত্যা প্রতিরোধ) নামে একটি আন্দোলন শুরু করেছে, যার অধীনে গরু হত্যা করার অভিযোগে মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর সহিংসতা করা হচ্ছে। গৌরক্ষা (গরু রক্ষা) নামক আন্দোলনের মাধ্যমে বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুন্ডারা নিয়মিত মুসলমানদের দলবদ্ধভাবে হত্যা করছে।

সাত. ২০২০ সালে উত্তর প্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের সরকার নামধারী 'লাভ জিহাদ' রোধ করার জন্য অবৈধ ধর্ম পরিবর্তন নিয়ে একটি বিল পাস করেছে। এই বিলে উত্তর প্রদেশে বজরং দল ও তাদের গুন্ডাদের খোলামেলা ছাড় দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা বাধ্য করতে পারে যে, যদি কোনও হিন্দু মেয়ে মুসলিম বা খ্রিস্টান ছেলের সঙ্গে বিয়ে করে, অথবা যদি কোনও উচ্চবর্ণের মেয়ে নিম্নবর্ণের ছেলের সঙ্গে বিয়ে করতে যায়, তবে সেটা জোরপূর্বক বাধা দেওয়া হবে।

আট. ২০২২ সালে দেশ সেবক হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল হালাল মাংসের ক্রয়-বিক্রয়ের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের সময় এসব সংগঠনের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে হালাল মাংস কেনার জন্য নিষেধ করছিল। এই আন্দোলনের সময়, ২০২২ সালের মার্চ মাসে বজরং দলের গুন্ডারা হালাল মাংস বিক্রেতাদেরও আক্রমণ করে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ

বজরং দলের কর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ সক্রিয়। ফেসবুকের সিকিউরিটি টিম তাদের একটি রিপোর্টে ভারতীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উসকে দিতে হিন্দুদের প্ররোচিত করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী একটি বিপজ্জনক সংগঠন হিসেবে বজরং দলকে চিহ্নিত করেছে। তবুও, বজরং দল এবং এই ধরনের অন্যান্য হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের অ্যাকাউন্ট এবং তাদের কন্টেন্ট ফেসবুক থেকে সরানো হয় না, কারণ ফেসবুক এমনটি করলে ভারতের বাজারে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

দুর্গা বাহিনী (Durga Vahini)

দুর্গা বাহিনী (দুর্গার[৩৯] বাহিনী) বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নারীদের শাখা। এটি ১৯৯১ সালে রাম জন্মভূমি আন্দোলনের শীর্ষকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন সাধ্বী রিতাম্বরা। তিনি সেই নারী, যিনি বাবরি মসজিদের ধ্বংসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সেই বক্তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যারা হিন্দু গুন্ডাদের বাবরি মসজিদ ধ্বংস করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি নিজেও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন।

দুর্গা বাহিনী বিশেষত এমন তরুণীদের নিযুক্ত করে, যাদের আয়ের পরিমাণ কম এবং নিম্নবর্ণের পরিবার থেকে আসে। যোগদান করা নারীদের কারাতে ও লাঠি চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তার সাথে সাথে তাদের মতাদর্শিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ধরনের নারীদের নিযুক্ত করা হয়, যাতে তাদের মাধ্যমে দাঙ্গা ও সহিংসতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিপজ্জনক কাজ করানো যায়, যা সুখী পরিবার এবং উচ্চবর্ণের পরিবারের নারীদের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তাই, এই বিপজ্জনক কাজগুলোর জন্য তাদের দারিদ্র্য ও নিম্নবর্ণের পরিচয়কে শোষণ করা হয়। যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন দাঙ্গা শুরু করার উদ্দেশ্যে হিন্দুরা কোনো মিছিল বের করে, তখন দুর্গা বাহিনীর নারীরা মিছিলে সামনে এগিয়ে মুসলিম এলাকায় ঢুকে পড়ে, মুসলিমদের উত্তেজিত করতে উস্কানিমূলক স্লোগান দেয় এবং তারা পুরোদমে চেষ্টা করে যাতে মুসলিমরা উত্তেজিত হয়ে এমন কিছু করে ফেলুক, যাতে অজুহাত হিসেবে বজরং দল-এর গুণ্ডারা তাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। এবং যখন দাঙ্গা শুরু হয়, তখন দুর্গা বাহিনীর নারীরা বজরং দল-এর গুণ্ডাদের সঙ্গে লাঠি নিয়ে মুসলিমদের উপর আক্রমণে প্রথম সারিতে থাকে।

বাবরি মসজিদের ধ্বংসকরণে সাধ্বী রিতাম্বরা'র নেতৃত্বে দুর্গা বাহিনীর নারীরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

ঠিক এরকমভাবে, গুজরাট দাঙ্গার সময় দুর্গা বাহিনীর নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই নারীরা ভোটার তালিকা এবং ব্যবসায়িক লাইসেন্সের সাহায্যে মুসলিম পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে বজরং দল এবং তাদের গুন্ডাদের কাছে খবর পৌঁছাতেন। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুসলিম পরিবারগুলোর পুরুষ, নারী ও শিশুদের সংখ্যা সংগ্রহ করে, সেই তথ্য বজরং দলকে সরবরাহ করতেন। এমনকি মুসলিম

[৩৯] দুর্গা হিন্দুদের অনেক বাহু বিশিষ্ট যোদ্ধা দেবী। তাকে 'শক্তি দেবী' বা 'শক্তির দেবী'ও বলা হয়।

নারীদের ধর্ষণ এবং মুসলিম নারী ও শিশুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনাগুলোতেও দুর্গা বাহিনীর নারীরা বজরং দলের গুন্ডাদের সহায়ক ছিলেন।

২০২২ সালে কর্ণাটকে হিজাব পরিহিত মুসলিম ছাত্রীদের হেনস্থা করা, তাদের হিজাব টেনে ছিঁড়ে ফেলা এবং তাদের উপর কটূক্তি করা, এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে বজরং দল গোষ্ঠীর গুন্ডাদের সাথে অগ্রগামী ছিল দুর্গাবাহিনী নারীরা।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (Akhil Bhartiya Vidiyarthi Parishad)

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (All India Student Organisation) হচ্ছে আরএসএসের ছাত্র শাখা। এবং তিরিশ লাখেরও বেশি সদস্য নিয়ে এটি ভারতের সবচেয়ে বড় ছাত্র সংগঠন। এটি ১৯৪৮ সালে আরএসএসের গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক বলরাজ মাধোক (Balraj Madhok)[৪০] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে আরএসএসের আরেক গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক, মুম্বাই ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বিশ্বনাথ রাও কেলকার (Yashwant Rao Kelkar) এর প্রধান প্রশাসক হন। কেলকারকে অখিল ভারতীয় ছাত্র পরিষদের প্রকৃত স্থপতি হিসেবে মানা হয়।

এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই সংগঠন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সাথে জড়িত ছিল, এবং বিশেষভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং মুসলিম-বিরোধী অবস্থান হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে এর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এর সদস্যসংখ্যা এক লাখ ষাট হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল, এবং এর বিভিন্ন শাখা ৭৯০টি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে, যার মধ্যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল, এটি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাতেও এই সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল, যার ফলে এর খ্যাতি আরও বেড়ে যায়। ২০১৪ সালে মোদির সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর্যন্ত এর সদস্যসংখ্যা ৩১ লাখ ৭৫ হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল।বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের হয়রানি করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় এই সংগঠনের গুন্ডারা জড়িত থাকে। ইতপূর্বে বিভিন্ন সময়ে

[৪০] বলরাজ মাধোক আরএসএসের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী ছিলেন। তিনি জম্মুর বাসিন্দা ছিলেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরে আরএসএসের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। যখন গোলওয়ালকর শ্যাম প্রকাশ মুখার্জিকে ভারতীয় জনসংঘ গঠনের প্রস্তাব দেন, তখন আরএসএসের পক্ষ থেকে বলরাজ মাধককে অন্যান্যদের সাথে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে তিনি ভারতীয় জনসংঘের সভাপতি হন এবং ১৯৯৭ সালের নির্বাচন পর্যন্ত জনসংঘের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্ণাটক ও অন্যান্য রাজ্যে হিজাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং হিজাব পরিহিত ছাত্রীদের হেনস্থা করার ঘটনায় বজরং দল ও দুর্গাবাহিনীর সাথে এই সংগঠনের গুন্ডারাও জড়িত ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংঘ পরিবার থেকে যুক্ত অ-হিন্দু সংগঠনসমূহ

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ (National Front of Muslims)

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ আরএসএসের পক্ষ থেকে মুসলিম সমাজে হিন্দুত্ববাদের মতবাদ প্রচারের জন্য গঠিত একটি সংগঠন। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ২০০২ সালে আরএসএসের তৎকালীন প্রধান সংঘচালক কেএস সুদর্শন কর্তৃক করা হয়েছিল। সংগঠনটির জাতীয় কনভেনর হিসেবে মোহাম্মদ আফজল নামক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয়, এবং আরএসএসের দিকনির্দেশনার জন্য একজন প্রচারক অন্দ্রেশ কুমারকে সাথে যুক্ত করা হয়।

এই সংগঠনটি দাবি করে যে আরএসএস এবং এর সাথে যুক্ত সংগঠনগুলোর প্রতি মুসলমানদের উদ্বেগগুলো অমূলক, এবং ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্বের অভাবের মূল দায়ী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।[৪১]

এটি আরএসএস কর্তৃক শুরু হওয়া অনেক আন্দোলন ও প্রচারণার পূর্ণ সমর্থক, যার মধ্যে গরু জবাই নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত।[৪২]

নভেম্বর ২০০৯ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ একটি প্রস্তাব পাস করে, যাতে 'বন্দে মাতরম' কে অস্বীকার করে সেটিকে অমুসলিম সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এর আহ্বায়ক মোহাম্মদ আফজল বলেছিলেন:

> "আমাদের মুসলিম ভাইদের এই ফতোয়া অনুসরণ করা উচিত নয়, কারণ 'বন্দে মাতরম' দেশটির জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে এটি গাওয়া এবং সম্মান করা উচিত।"

তিনি এটিও বলেছেন:

[৪১] দ্য স্যাফরন মুসলিমস (The Safiron Muslims)- দানিশ রেজা, হিন্দুস্তান টাইমস, ১৮ জানুয়ারি ২০১৪

[৪২] দ্য স্যাফরন মুসলিমস (The Safiron Muslims)- দানিশ রেজা, হিন্দুস্তান টাইমস, ১৮ জানুয়ারি ২০১৪

"যে মুসলিমরা 'বন্দে মাতরম' গাইতে অস্বীকার করেন, তারা ইসলাম এবং ভারত উভয়ের বিরুদ্ধে।"[৪৩]

আগস্ট ২০০৮ সালে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ 'পয়গামে ঈমান যাত্রা' নামক একটি মিছিলের আয়োজন করেন, যা লাল কেল্লা, দিল্লি থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত চলেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরে অমরনাথ যাত্রার জন্য স্থান বরাদ্দের সমর্থন করা। এই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঝারখণ্ডের শাহী ইমাম মাওলানা হাজবুর রহমান মিরাঠী, কিন্তু মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল জনা পঞ্চাশেক।

নভেম্বর ২০০৯ সালে এই সংগঠনটি মে মাসে ইন্ডিয়া গেটের দিকে তেরঙ্গা যাত্রার (ভারতের জাতীয় পতাকার সম্মানে মার্চ) আয়োজন করে, যেখানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। এক হাজার অংশগ্রহণকারী সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করার এবং নিজেদের অঞ্চলে এর বিরুদ্ধে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।[৪৪]

সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে এই সংগঠনটি ভারতীয় সংবিধান থেকে আর্টিকেল ৩৭০ (যা রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে) বাতিল করার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান শুরু করে। সংগঠনের দাবি, বাতিলের সমর্থনে তারা সাত লাখ মুসলমানের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে।[৪৫]

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই সংগঠন নরেন্দ্র মোদির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছিল। মোহাম্মদ আফজাল ঘোষণা করেছিলেন যে, তাদের সংগঠন এই প্রচারণার সময় নির্বাচনের আগে পাঁচ কোটি মুসলমানের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে।[৪৬]

---

[৪৩] মুসলিম অর্গানাইজেশন স্ল্যামস বন্দে মাতরম ফতোয়া (Muslim organisation slams Vande Mataram fatwa), দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৯ই নভেম্বর, ২০০৯। এই নিউজে বলা হয়েছে- 'মুসলিম সংগঠন "বন্দে মাতরম" সম্পর্কিত কোনো ফতোয়ার সমালোচনা করেছে।'

[৪৪] প্রো-আরএসএস মুসলিমস টেক অ্যান্টি-টেরর ভাউ (Pro-RSS Muslims take anti-terror vow), হিন্দুস্তান টাইমস, ১৯ই নভেম্বর, ২০০৯। এখানে বলা হয়েছে যে, আরএসএস সমর্থিত কিছু মুসলমান সন্ত্রাসবাদ বিরোধী শপথ নিয়েছেন। এটি বোঝায় যে, কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আরএসএস-এর মধ্যে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্তির একটি প্রচেষ্টা ছিল।

[৪৫] সেভেন লাখ মুসলিমস হ্যাভ সাইন্ড আপ ফর রিভোকিং আর্ট. ৩৭০: আরএসএস আউটফিট (৭ Lakh Muslims have signed up for revoking Art. ৩৭০: RSS outfit), ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৯শে ডিসেম্বর, ২০১২। এই নিউজ থেকে বোঝা যায় যে, ৭ লক্ষ মুসলমান নাকি ধারা ৩৭০ বাতিলের সমর্থনে সই করেছেন। এটি যে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা অপসারণে কতিপয় হিন্দুত্ববাদী নামধারী মুসলিম সমর্থন, তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

[৪৬] ফলো ইয়োর কনসিয়েন্স: আরএসএস টু আপিল টু মুসলিমস (Follow your conscience: RSS to appeal to Muslims), - পবন দাহাট, দ্য হিন্দু, ২রা মার্চ, ২০১৪। এখানে বলা হচ্ছে যে, আরএসএস নাকি

২০১৫ সালে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে যোগ-অনুশীলনের সমর্থনে 'ইউগা আওর ইসলাম' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে বলা হয়েছিল যে যোগ-অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। পাশাপাশি এও দাবি করা হয়েছিল যে নামাজও যোগব্যায়ামের একটি অনুশীলন পদ্ধতি।[৪৭]

রাষ্ট্রীয় শিখ সংঘ (National Sikh Association)

১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশন ব্লু স্টারের ফলস্বরূপ, শিখদের মধ্যে হিন্দুদের প্রতি ঘৃণার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিকার এবং শিখদের মধ্যে হিন্দু মতাদর্শ প্রচারের জন্য আরএসএস ২৪ নভেম্বর ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রীয় শিখ সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। আরএসএস নিয়মিতভাবে শিখদের হিন্দু হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিখদের মধ্যে হিন্দু পরিচিতি সাধারণ করা। ২০০২ সালে আরএসএসের পক্ষ থেকে করা মন্তব্যে যে, "শিখরা আসলে হিন্দু" শিখদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়। ২০১২ সালে আরএসএসের সর্বোচ্চ নেতা প্রধান সংঘচালক কে এস সুধার্শন সেই একই দাবি পুনরায় উচ্চারণ করেন, তবে কিছু শব্দের পরিবর্তন সহ এবং তিনি বলেন, "শিখরা আসলে সংস্কৃত হিন্দু"।

২০০৪ সালে অকাল তখত[৪৮] থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রীয় শিখ সঙ্গঠন একটি শিখ-বিরোধী সংগঠন এবং সমস্ত শিখদের এই সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এই নিষেধাজ্ঞা এখনও কার্যকর।[৪৯] অকাল তখতের মতে, এই সংগঠনটি আরএসএসের পক্ষ থেকে

মুসলমানদের কাছে তাদের অন্তরের কথা শোনার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। আর তাদের অন্তরের কথা যে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

[৪৭] গভর্মেন্ট পুশেস যোগাস ইউনিভার্সাল অ্যাপিল, মিনিস্ট্রি রিলিজেস বুক (Govt. pushes yoga's universal appeal, Ministry releases book), দ্য হিন্দু, ১৮ই জুন, ২০১৫। হিন্দুত্ববাদী সরকার যোগব্যায়ামের সার্বজনীন আবেদন বা গ্রহণযোগ্যতাকে সামনে আনার উদ্যোগ হিসেবে এই বইটি প্রকাশ করা হয়েছে।

[৪৮] অকাল তখত শিখদের পাঁচটি তখতের মধ্যে একটি, যেখান থেকে সারা পৃথিবীতে থাকা শিখদের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই তখতগুলো থেকে দেয়া আদেশ প্রতিটি শিখের জন্য বাধ্যতামূলক। অকাল তখত আমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরের পরিসরে নির্মিত হয়েছে।

[৪৯] কিপ ডিস্টেন্স ফ্রম আরএসএস ইভেন্ট, আকাল তখত আস্কস শিখ কমিউনিটি টু কিপ ডিস্টেন্স (Akal Takht asks Sikh community to keep distance from RSS event)। এই নিউজে আমরা দেখতে পাই যে, অকাল তখত শিখ সম্প্রদায়কে আরএসএসের অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছে, আউটলুক ইন্ডিয়া.কম

শিখদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদের প্রচার করার একটি চেষ্টা, এবং আরএসএস শিখদের হিন্দু ধর্মে একীভূত করতে চায়।[৫০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংঘ পরিবারের সাথে সম্পর্কিত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান

হিন্দু বিবেক কেন্দ্র (Hindu Vivek Kendra)

হিন্দু বিবেক কেন্দ্র (Hindu Vivek Kendra) হল একটি আরএসএস-সংযুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা বিশেষভাবে হিন্দুত্ববাদের বিষয়সমূহ নিয়ে গবেষণা করে। এই প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি মূল কাজ হলো:

এক. হিন্দুত্ববাদের সমর্থক এবং বিরোধী বইয়ের একটি লাইব্রেরি তৈরি করা।

দুই. যেসব ব্যক্তি হিন্দুত্ববাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিকভাবে অবদান রেখেছেন, তাদের চিহ্নিত করা, তাদের এই বিষয়ের উপর লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো এবং তাদের চিন্তাভাবনাগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। **তিন**. মানুষদের এই বিষয়ের উপর গবেষণা করতে উৎসাহিত করা, তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করে এই বিষয়ে তাদের পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগে সহায়তা করা।

চার. হিন্দুত্ববাদ সম্পর্কিত উপকরণ ভারতের মধ্যে এবং বিদেশে একাডেমিক মহলে পৌঁছানো।

পাঁচ. আন্তর্জাতিক স্তরে বন্ধুত্বের পক্ষে এবং বিপক্ষে লেখালেখির উপর নজর রাখা।

বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন (Vivekananda International Foundation)

১৯৭২ সালে আরএসএস-এর প্রচারক একনাথ রানাড়ে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'বিবেকানন্দ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেন, যার মূল বিষয় ছিল গ্রামীণ উন্নয়ন, শিক্ষা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন। ২০০৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি পাবলিক পলিসি থিংক ট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 'ভিভেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করে এবং এর

[৫০] আকাল তখত চিফ কলস ফর আরএসএস টু বি ব্যানড (Akal Takht Chief calls for RSS to be banned)। এই নিউজ থেকে আমরা জানতে পারি যে, অকাল তখতের প্রধান আরএসএসকে নিষিদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, দ্য ওয়্যার

পরিচালক হন সাবেক ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) প্রধান অজিত দোভাল[৫১]। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা, সাবেক ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা এবং সাবেক সামরিক কর্মকর্তা হন। অজিত দোভালের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য প্রখ্যাত সদস্যদের মধ্যে সাবেক RAW প্রধান মসি ডি সাহে, সাবেক এয়ার স্টাফ প্রধান শ্রীনবাস পরমকৃষ্ণস্বামী, এবং সাবেক এয়ার স্টাফ ভাইস চিফ এসজি অনামদার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান প্রধান হলেন অরবিন্দ গুপ্তা, এবং এর জুনিয়র প্রেসিডেন্ট হলেন আরএসএস-এর চিন্তাবিদ (বুদ্ধিজীবী) মসামি নাথন গর্ড মূর্তি।

২০১১-১২ সালে আন্না হাজারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যা পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়কর পরাজয়ের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই আন্দোলন গড়ে তোলার পেছনে ওই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকারে আসার পর, তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের অনেক সদস্যকে নিজের সরকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। অজিত ডোভালকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং অরবিন্দ গুপ্তাকে উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেন। এছাড়া ওই প্রতিষ্ঠানের আরও অনেক সদস্যকে সরকারে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা অর্থাৎ অল-ইন্ডিয়া হিস্ট্রি রিফর্ম প্রজেক্ট (All-India History Reform Project) নামক প্রকল্পটি আরএসএস-এর এক প্রচারক মোরো পান্ত পাঙ্গলে ১৯৭৩ সালে প্রস্তাব করেছিলেন, যা আরএসএস ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হল ভারতীয় ইতিহাসকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পুনঃলিখন করা, যাতে ভারতের ইতিহাসকে নির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। কুমার ডোভাল (২০02 থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ভারতের ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) ডিরেক্টর এবং ২০১৪ সাল থেকে নরেন্দ্র মোদীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা) এর এই পুনর্লিখন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

[৫১] অজিত কুমার ডোভাল (Ajit Kumar Doval) ২০০৪ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)-এর পরিচালক ছিলেন। ২০১৪ সাল থেকে তিনি নরেন্দ্র মোদির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৯ সালে কান্দাহারে ভারতীয় বিমান ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আলোচনায় যে তিন সদস্যের দল অংশ নিয়েছিল, সেই দলে অজিত ডোভালও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এই সংগঠনের মতে, ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস পুরনো রচনাবলি। এই পুরনো রচনাবলী হিন্দু দেব-দেবীর গল্প-কাহিনী সম্পর্কিত ১৮টি বড় এবং ১৮টি ছোট বইয়ের সমাহার, যেগুলি তৃতীয় থেকে দশম শতাব্দী খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল। তাদের মতে, ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতের ইতিহাসে বিকৃতি আনা হয়েছিল এবং এতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছিল, যদিও বাস্তবে ভারতের সংস্কৃতি একটি একক হিন্দু সংস্কৃতি।

এই সংগঠনের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ এ কথা প্রমাণ করার উপর আছে যে, আর্য বংশধররা কোনো বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে অভিবাসন করে আসেনি, বরং তারা ভারতবর্ষের প্রকৃত অধিবাসী। তাদের মধ্যে কিছু পরে ভারত থেকে বেরিয়ে অন্য অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেগুলোকে সভ্য বানানো হয়েছিল। সংগঠনের বক্তব্য হল যে, উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং আদিবাসী"রা[৫২] একই বংশধর"। কিন্তু আদিবাসীদের মানসিক স্তর ছিল নিচু, অপরদিকে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মানসিক স্তর ছিল উঁচু এবং তারা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইতিহাস পড়ানোর দায়িত্বে থাকা প্রায় ৫০০ জন অধ্যাপক এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে সরকারে আসার পর ভারতের ইতিহাস গবেষণার সবচেয়ে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিকাল রিসার্চ (ICHR)-এর চেয়ারপারসন হিসেবে এই সংগঠনের অন্ধ্র প্রদেশ শাখার প্রধান নীলা প্রগদ সিদ্ধার্থ রাওকে নিয়োগ দেন। এছাড়াও, ২০১৫ সালে এই সংগঠনের সহ-সভাপতি নারায়ণ রাও, সাধারণ সম্পাদক ঈশ্বর শরণ ভেটুকরম এবং সংগঠনের বঙ্গীয় শাখার প্রধান ইংলিশ গোয়াকে আইসিএইচআর-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই সংগঠনের আরও অনেক সদস্যকে আইসিএইচআর এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT)-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এনসিইআরটি ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রম তৈরির দায়িত্বে থাকা একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে আরএসএস সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির পর থেকে বড় পরিসরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমকে হিন্দুত্ববাদের আদর্শ অনুযায়ী রূপান্তরিত করার কাজ চলছে।

[৫২] ২ ভারতের মূল আদিবাসী বাসিন্দা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংঘ পরিবার থেকে পৃথক হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ ধারণকারী সংগঠনসমূহ

সংঘ পরিবার থেকে পৃথক হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ ধারণকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম হলো হিন্দু মহাসভা। তবে যেহেতু এটি হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের প্রথম সংগঠন এবং হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠন, তাই এটির উল্লেখ এই অধ্যায়ের শুরুতেই করা হয়েছে। এর পরের অংশে এমন কিছু সংগঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ ধারণ করে বা এর সমর্থক, তবে তারা সরাসরি সংঘ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শিবসেনা (Shiv Sena)

শিবসেনা (শিবাজীর[৫৩] ফৌজ) মহারাষ্ট্রের একটি মারাঠি হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল। এটি ১৯২৬ সালে কার্টুনিস্ট বাল ঠাকরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল মারাঠি জনগোষ্ঠীকে মহারাষ্ট্রে অন্যান্য অঞ্চল, বিশেষত উত্তর ভারত থেকে আসা লোকদের তুলনায় চাকরি ও সুযোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া। সংগঠনের অবস্থান ছিল যে উত্তর ভারত থেকে আসা লোকেরা স্থানীয় মারাঠিদের অধিকার দখল করছে।

১৯৬০ সালে বাল ঠাকরে বিদ্রূপাত্মক কার্টুন নিয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা "মারমুক" প্রকাশ করা শুরু করেন। এর মাধ্যমে তিনি মহারাষ্ট্র, বিশেষ করে মুম্বাইয়ে অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় মারাঠিদের আবেগকে উসকে দেওয়া শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে বাল ঠাকরে এই উদ্দেশ্যে "শিবসেনা" নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সূচনা করেন।

অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার কারণে বাল ঠাকরে অনেক বেকার মরাঠি যুবকদেরকে নিজের দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই কর্মীরা মহারাষ্ট্রে বসবাসকারী অনেক

[৫৩] শিবাজি ভোঁসলে (১৯৩০ থেকে ১৯৮০) যিনি ছত্রপতি শিবাজি নামে পরিচিত, দক্ষিণ ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্যের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে অঞ্চলের আদিল শাহি সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং এর অঞ্চল দখল করে ১৯৩৫ সালে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৩ সালে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক ছত্রপতি হন। মারাঠা সাম্রাজ্য স্বীয় উত্থান-যুগেই দক্ষিণে তামিলনাড়ু থেকে উত্তরে পাঞ্জাব এবং পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজের পূর্বে মারাঠা সাম্রাজ্যই মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষে কর্তৃত্ব হারানোর কারণ হয়েছিল। সমস্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদী শিবাজিকে তাদের নায়ক হিসেবে বিবেচনা করেন এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো শিবাজির পতাকা ভাগওয়া ধ্বজকে ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি করে।

উত্তর ভারতীয়দের বাড়িঘরে হামলা চালায় এবং উত্তর ভারতের হোটেলগুলোতেও ভাঙচুর করে। তারা হোটেল মালিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করে, যাতে তারা শুধুমাত্র মরাঠিদের চাকরি দেয়।

কিন্তু শুরুর কয়েক বছরের মধ্যেই মারাঠা অধিকার এবং ভূমিপুত্র (মাটির সন্তান) আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে এবং তা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। এর ফলস্বরূপ, ১৯৭০-এর দশকের শুরু থেকে শিবসেনা হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ গ্রহণ করে। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গঠনের পর, ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে শিবসেনা বিজেপির সঙ্গে জোট গঠন করে।

২০০২ সালে বাল ঠাকরে তার ছেলে উদ্ধব ঠাকরেকে শিবসেনার প্রধান নিযুক্ত করেন। ২০০৫ সালে শিবসেনা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং শিবসেনার অন্যতম প্রধান নেতা নারায়ণ রাণেকে দল থেকে বহিষ্কার করে, যার ফলে দলে অভ্যন্তরীণ বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই বিরোধের ফলস্বরূপ, বাল ঠাকরের ভাতিজা রাজ ঠাকরে দল ত্যাগ করেন এবং নিজস্ব সংগঠন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে বাল ঠাকরের মৃত্যুর পর শিবসেনার নেতৃত্ব পুরোপুরি উদ্ধব ঠাকরের হাতে চলে যায়।

২০১২ সালের নির্বাচনে শিবসেনা ও বিজেপির মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়, যার ফলে তাদের জোট ভেঙে যায়। ২০১৪ সালের নির্বাচনে উভয় দল আলাদা আলাদাভাবে অংশগ্রহণ করে। বিজেপি নির্বাচনে জয়লাভ করে, আর শিবসেনা বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করার ঘোষণা দেয়। তবে পরে উভয় দলের মধ্যে আলোচনা হয়, যার পর শিবসেনা দুইবার বিজেপির সাথে জোটে ফিরে আসে।

জানুয়ারি ২০১৮ সালে শিবসেনা আবারও বিজেপি থেকে আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে নির্বাচনের আগে পুনরায় জোটে যোগ দেয়। নির্বাচনে শিবসেনা কম ভোট পায় এবং বিজেপি তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সরকার গঠনে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে শিবসেনা পুনরায় জোট থেকে বেরিয়ে যায়। শিবসেনার জোট থেকে বেরিয়ে আসার কারণে মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, এবং শিবসেনা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধে। এর ফলে শিবসেনার প্রধান উদ্ধব ঠাকরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কংগ্রেসের সঙ্গে শিবসেনার এই সরকার গঠনের জোটের নাম রাখা হয় "মহা বিকাশ আঘাদি"।

উদ্ধব ঠাকরে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার পর তার সংগঠনকে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে এনে সেক্যুলার মতাদর্শের কাছে নিয়ে আসেন। বিজেপি ও

সংঘ পরিবারের পক্ষ থেকে মহারাষ্ট্রের নেতৃত্ব পুনরায় নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা হয়, কারণ মহারাষ্ট্র সাংগঠনিকভাবে সংঘ পরিবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপি শিবসেনার সদস্যদের কিনে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে, যার ফলে সংগঠনের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হতে শুরু করে। একটি গোষ্ঠী তাদের মতাদর্শে ফিরে যেতে এবং বিজেপির সঙ্গে জোট করতে চেয়েছিল। সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য একনাথ শিন্ডে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শিবসেনার ১৯ জন বিধায়কের মধ্যে ১২ জনকে নিজের পাশে নিয়ে উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধে একত্রিত করেন।

২৯ জুন ২০২২ সালে উদ্ধব ঠাকরে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং একনাথ শিন্ডে মহারাষ্ট্রের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় ভূমিকা

১৯৭০ সালে আরএসএস এবং শিবসেনা মিলে মহারাষ্ট্রের ভিওণ্ডিতে মুসলমানদের অঞ্চলে প্রবেশ করে দাঙ্গা শুরু করে। এই দাঙ্গার ফলে ২০০ এরও বেশি মুসলিম শহীদ হন। এই দাঙ্গায় মহারাষ্ট্রের পুলিশ সম্পূর্ণভাবে আরএসএস ও শিবসেনার পক্ষ নিয়ে কাজ করছিল, এবং অনেক মুসলিম পুলিশের গুলিতে শহীদ হন, যাদের আগে থেকেই শিবসেনা এবং আরএসএসের গুন্ডাদের লাঠির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল। এই গুন্ডারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাঠি ছাড়াও ছুরি এবং অ্যাসিডের বেপরোয়া ব্যবহার করেছিল। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিচারক দিনেশ পিরোশা মদনের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, পুলিশ পুরোপুরি হিন্দু দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে ছিল এবং দাঙ্গার পর হিন্দু দাঙ্গাবাজদের আটক করার পরিবর্তে ২১৮৩ মুসলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যেখানে মাত্র ৩২২ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের বেশিরভাগই জামিনে মুক্ত হয়ে যায়। রিপোর্টে বলা হয়, হিন্দু দাঙ্গাবাজরা মুসলমানদের ২৫০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে, ১২টি বাড়িতে হামলা করেছে এবং এর মধ্যে ৮টি বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে, বাকি বাড়িগুলোর ব্যাপক ক্ষতি করা হয়েছে। মুসলমানদের ৩৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৯৭ রুপি মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে (১৯৭০ সালের ভারতীয় রুপি হিসেবে) এবং ২১৪ মুসলিম শহীদ হয়েছেন।

১৯৮৪ সালে শিবসেনা মুম্বাই, থানে এবং ভিওন্ডির এলাকায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু করে। এই দাঙ্গায় ৭৮২ জন মানুষ নিহত হন, এবং ১১৮ জন আহত হন। নিহত ও আহতদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলিম ছিল।

১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায়, মুম্বাইয়ের দক্ষিণভাগের ডংরি এলাকায় কিছু মুসলিমরা প্রতিবাদ শুরু করেছিল এবং অভিযোগ রয়েছে যে, এই

প্রতিবাদ চলাকালীন এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায়, শিবসেনা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ শুরু করে প্রতিশোধ নিতে, যার ফলে পুরো মুম্বাইয়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এই দাঙ্গার ফলস্বরূপ, ৫৭৫ মুসলিম নিহত হন।

বিতর্কিত বিবৃতি এবং পদক্ষেপসমূহ

২০১২ সালে একনাথ শিন্ডে এবং তার পূর্বে দলের প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরে দাবি করেছিলেন যে মুসলমানদের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত।

২০১৫ সালে শিবসেনা ঘোষণা করে যে, তারা উত্তরপ্রদেশে ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচটি সন্তান থাকা হিন্দু পরিবারের জন্য এক লাখ রুপি পুরস্কার প্রদান করবে। শিবসেনার মতে, এই পুরস্কারের কারণ হল সাম্প্রতিক জনগণনা অনুযায়ী হিন্দুদের জনসংখ্যার হার মুসলমানদের জনসংখ্যার তুলনায় কম।

২০১৬ সালে শিবসেনার পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, ভারতের সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি চিরতরে বাদ দেওয়া উচিত।

২০১৯ সালে শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত দাবি করেন যে, বোরখা (চাদর) সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা উচিত।

২০২০ সালে শিবসেনার নেতা বলেছিলেন যে, শিবসেনা অখণ্ড ভারত হিসেবে ভারতের পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পক্ষে এবং খুব শীঘ্রই পাকিস্তানও ভারতের অংশ হয়ে যাবে।

মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (Maharashtra Navnirman Sena)

মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা বা মহারাষ্ট্র রিফর্মেশন আর্মি (Maharashtra Reformation Army) গঠন করেছিলেন রাজ ঠাকরে। তিনি ২০০৬ সালে শিবসেনা থেকে আলাদা হয়ে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ ঠাকরে এই পদক্ষেপের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, শিবসেনা তার প্রাক্তন গৌরব হারিয়ে ফেলেছে এবং এখন এটি দুই টাকা মূল্যের ক্লার্কদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

রাজ ঠাকরে তার সংগঠনকে শিবসেনার প্রাথমিক দর্শন, অর্থাৎ ভূমি-বেটা (ভূমিপুত্র) এবং মারাঠা অধিকার ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর ফলে পরবর্তী বছরগুলিতে এই সংগঠন উত্তর ভারতের বাসিন্দাদের হেনস্থা, তাদের ওপর সহিংসতা এবং তাদের

সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করতে জড়িত ছিল। এর পাশাপাশি, এই অবমাননার জন্য একাধিকবার শিবসেনার সঙ্গে সংঘর্ষও ঘটেছিল।

২০১৯ সালে শিবসেনার মতাদর্শ থেকে আলাদা হয়ে এবং কংগ্রেসের সাথে জোট করার পর, জানুয়ারি ২০২০ সালে রাজ ঠাকরে তার সংগঠনের মতাদর্শ ভূমিপুত্র থেকে পরিবর্তন করে হিন্দুত্ববাদে পরিণত করেন এবং তার দলের পতাকার রংও জাফরান, অর্থাৎ গেরুয়া করা হয়। এই সময় তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বলেন যে, সমস্ত অশান্তির জন্য মুসলমানদের নামাজ দায়ী। এর পাশাপাশি তিনি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের সমর্থনও জানান এবং বলেন:

> "আমার দেশে শুধু ভারতীয়রা থাকতে পারেন, অন্যান্য দেশগুলোর লোকেরা পাসপোর্ট এবং ভিসা ছাড়া ভারতে থাকার অধিকার রাখে না।"

তিনি আরও বলেন:

> "তাহলে এই পলিটিক্যাল পদক্ষেপে কী সমস্যা?"

তিনি বলেন:

> "বাংলাদেশী এবং পাকিস্তানিদেরকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে, না হলে তাদের জোর করে তুলে ফেলে দেওয়া হবে।"

শিরোমনি আকালি দল (Shiromani Akali Dal)

শিরোমনি আকালি দল (Supreme Akali Party) পুরো বিশ্বে শিখদের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল। শিখদের মৌলিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- শিরোমনি গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটি এবং দিল্লি শিখ গুরুদুয়ারা ম্যানেজমেন্ট কমিটি এই দলই পরিচালনা করে। এই দল নিজেদেরকে শিখদের মূল প্রতিনিধিরূপে মনে করে এবং এর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও ছিল শিখদের সমস্যাগুলোকে রাজনৈতিক কণ্ঠ প্রদান করা।

এই দলের প্রতিষ্ঠা ১৪ ডিসেম্বর ১৯২০ সালে হয় এবং এর প্রথম সভাপতি ছিলেন সরদার সারলখ সিংহ জিজল, যিনি পরবর্তীতে মাস্টার তারা সিংহ নামে পরিচিত হন। অন্যান্য শিখ সংগঠনগুলোর মতো, আকালি দলও ভারত ভাগের তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

১৯৫০ সালে আকালি দল পাঞ্জাব প্রদেশ আন্দোলন শুরু করে এবং পাঞ্জাবী ভাষাভাষীদের জন্য আলাদা প্রদেশের দাবি তোলে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন

সন্ন্যাসী ফতেহ সিংহ। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৬৬ সালে বর্তমান পাঞ্জাবের সৃষ্টি হয় এবং সেখানে আকালি দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

আকালি দল ভারত বিভাগের পর দ্রুতই তার সমর্থন আরএসএস-এর পক্ষেই স্থাপন করেছিল। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনের পর থেকে আকালি দল পাঞ্জাবে সরকার গঠন করেছে প্রথমে ভারতীয় জনসংঘের সাথে এবং পরে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে জোট বেঁধে। আকালি দলের বর্তমান সভাপতি শিখবীর সিং বাডাল।

আকালি দল দীর্ঘ সময় ধরে টুকরো টুকরো হওয়ার সমস্যায় ভুগছে এবং এর অনেকগুলো গোষ্ঠী গঠন হয়েছে। জুলাই ২০২০ সালে শিরোমণি আকালি দলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা আকালি দলের একটি প্রাক্তন গোষ্ঠী শিরোমণি আকালি দল (টিকসালী) এর সাথে জোট বেঁধে একটি নতুন গোষ্ঠী শিরোমণি আকালি দল (ডেমোক্রেটিক) তৈরি করে। সেই মাসের শেষের দিকে অন্যান্য দলগুলোও এই জোটে যোগ দেয় এবং আকালি দলের আরেকটি গোষ্ঠী ইউনাইটেড আকালি দলও এতে যুক্ত হয়, তারপর এই নতুন দলের নাম পরিবর্তন করে শিরোমণি আকালি দল (সঞ্জুক্ত) রাখা হয়। এই নতুন দলের দাবি যে, আসল আকালি দল এটি এবং তারা বিজেপির কাছে দাবি করেছে যে, তারা বাডালের আকালি দলের পরিবর্তে এই আকালি দলকে তাদের জোটে অন্তর্ভুক্ত করুক।

সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে আকালি দল বিজেপির সঙ্গে কৃষি সংস্কার বিল নিয়ে মতবিরোধে চলে যায়, যার ফলে তারা এনডিএ জোট থেকে বেরিয়ে যায়। এর পর তারা দলিত এবং অন্যান্য নিম্ন জাতির মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী দল বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে জোট বাঁধে, যা এখনও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

আকালি দলের দৃষ্টিভঙ্গি যদিও প্রাচীন এবং তাত্ত্বিকভাবে কঠোর নয়, কিন্তু বিভাজন পরবর্তী ভারত থেকে এটি অখণ্ড তাত্ত্বিকতার অনুসারী আরএসএসের সঙ্গে জোটবদ্ধ ছিল এবং দেশের স্তরে এর পূর্ণ সমর্থন ছিল। তাই একে কঠোর সংগঠনগুলোর তালিকায় রাখা হয়েছে। যদিও ২০২০ থেকে এটি বিজেপির সঙ্গে জোট থেকে বেরিয়ে গেছে, তবে এই মতবিরোধটি আদর্শিক নয়, বরং খাঁটি রাজনৈতিক ভিত্তিতে ছিল, তাই ভবিষ্যতে এটি বিজেপির সঙ্গে আবার জোটবদ্ধ হতে পারে। আর যদি এমন না হয়, তবে আকালি দল (সংযুক্ত) প্রকৃতপক্ষে মূল আকালি দলের রূপ নিতে পারে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে।

অভিনব ভারত (Abhinav Bharat)

অভিনব ভারত একটি যুদ্ধজীবী সংগঠন, যা অস্ত্রের মাধ্যমে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে এই সংগঠনের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। এই সংগঠনটি ২০০৬ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর রমেশ উপাধ্যায় এবং বর্তমানে সেবা পালনরত লেফটেন্যান্ট কর্পোরাল প্রসাদ শ্রীকান্ত পুরোহিত- এর হাতে মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালে নাথুরাম গডসের ভাতিজি এবং বিনায়ক দামোদর সাভরকরের ভাতিজার স্ত্রী হেমানি সাভরকরকে এই সংগঠনের প্রধান নির্বাচিত করা হয়।

অভিনব ভারত নামটি সাভারকরের গ্রেফতারির আগে গঠিত 'অভিনব ভারত সোসাইটি'র নামানুসারে রাখা হয়েছিল, যা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করত।

সংঘ পরিবার সংগঠনগুলির সাথে এই সংগঠনের সম্পর্কের মধ্যে ওঠা-বসা ছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদে উপস্থিত অধিকাংশ উগ্রপন্থী সদস্যরা এই সংগঠনের প্রতি আরও আকর্ষিত হয়েছিল এবং অনেকেই ডি.এইচ.পি. ছেড়ে এই সংগঠনে যোগ দিয়েছিল। এই সংগঠনটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তারা আরএসএসের শীর্ষ কর্মকর্তাদের, তার মধ্যে সংঘচালক মোহন ভগবতকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। এই সংগঠনের অবস্থান ছিল যে, মোহন ভগবত হিন্দুত্ববাদের জন্য যথেষ্ট কিছু করছেন না।

এই সংগঠন ২০০৬ সালে মালিগাঁও বোমা হামলায় জড়িত ছিল, যেখানে মহারাষ্ট্রের মালিগাঁও অঞ্চলের একটি মসজিদে সংযুক্ত এলাকায় দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই বিস্ফোরণে ৩৯ জন মুসলিম শহীদ হন এবং ১২৫ এর বেশি মুসলিম আহত হন।

এছাড়াও ২০০৭ সালে তিনটি আলাদা বোমা হামলায় এই সংগঠন জড়িত ছিল। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে চলা ট্রেন 'সমঝোতা এক্সপ্রেস' এ একটি বোমা হামলা ঘটে, যাতে ৬ দম্পতি নিহত এবং ৫০ জনেরও বেশি আহত হন। প্রথমে এই হামলার অভিযোগ লস্করে তাইয়েবা সংগঠনের বিরুদ্ধে উঠেছিল, কিন্তু পরে তদন্তে এটা প্রমাণিত হয় যে, এই বোমা হামলা আসলে 'অভিনব ভারত' নামক একটি গ্রুপই করেছে।

১৮ মে ২০০৭ সালে হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদে একটি বোমা হামলা করা হয়, যাতে ১৬ মুসলিম শহীদ হন এবং ১০০ এরও বেশি মানুষ আহত হন।

১১ অক্টোবর ২০০৭ সালে রাজস্থানে আজমিরে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির মাজারে একটি বোমা হামলা হয়, যার ফলে ৩ মুসলিম শহীদ এবং ৭০ জনেরও বেশি আহত হন।

২০০৬ সালে মালিগাঁও বোমা হামলা এবং ২০০৭ সালে তিনটি বোমা হামলার অভিযোগে এই সংগঠনের প্রধান সদস্য স্বামী অসীমানন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি উন্মোচন করেন যে, এসব হামলায় এই সংগঠনকে আরএসএস-এর প্রধান সংঘচালক মোহন ভাগবতের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। প্রমাণের ভিত্তিতে অভিনব ভারত এর সদস্যদের সাথে সাথে কিছু আরএসএস-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলানো হয়। কিন্তু মোদির সরকার ক্ষমতায় আসার পর, সমস্ত গ্রেপ্তারকৃতদের 'সন্দেহযুক্ত' হওয়ার সুবিধা দিয়ে মুক্ত ঘোষণা করা হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিন্দুত্ববাদের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য সংগঠন

ইন্দিরা গান্ধীর দ্বারা আরোপিত জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংযুক্তি থেকে প্রতিষ্ঠিত জনতা পার্টির যখন অবনতি হতে শুরু করেছিল, তখন এর বহু শাখা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে একটি ছিল সুব্রামানিয়ান স্বামীর নেতৃত্বে গঠিত জনতা পার্টি, যা হিন্দুত্ববাদকে তার মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল, যার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সীমিত উপস্থিতি ছিল। ২০১৩ সালে সুব্রামানিয়ান স্বামী বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন।

ভারতীয় জন সংঘের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯৬৬ সালে দলের সভাপতি থাকা বলরাজ মধোকের দলের ভেতরে অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং লাল কৃষ্ণ আদভানির সাথে মতবিরোধ ছিল। ১৯৭৩ সালে যখন লাল কৃষ্ণ আদভানি দলটির সভাপতি হন, তিনি মধোকের দলীয় সদস্যপদ তিন বছরের জন্য স্থগিত করে দেন। পরবর্তীতে যখন ভারতীয় জন সংঘ জনতা পার্টির সাথে একীভূত হয়, মধোকও এতে যোগ দেন, কিন্তু ১৯৭৯ সালে মতবিরোধের কারণে তিনি আলাদা হয়ে যান এবং 'অখিল ভারতীয় জন সংঘ' নামে জন সংঘকে আবার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, তবে এই দলটি বেশিদিন চলেনি এবং ভারতের মধ্যে তার উপস্থিতি প্রায় শূন্য ছিল। ২০০৪ সালে বিজেপির এক সদস্য প্রফেল গৌরাদিয়া বিজেপি থেকে মতবিরোধের কারণে দলটি ছেড়ে দেন এবং তিনি 'অখিল ভারতীয় জন সংঘ'-এর সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। যদিও এই সংগঠনও হিন্দুত্ববাদের আদর্শের সাথে যুক্ত, তবে এর রাজনৈতিক ভূমিকা খুবই গুরুত্বহীন।

পঞ্চম অধ্যায়

হিন্দুত্ববাদী সংগঠন সমূহের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংঘ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

জনসাধারণের জন্য সংবেদনশীল বিষয়গুলোতে সতর্ক কর্মপন্থা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে হিন্দু মহাসভার এবং আরএসএস-এর মতাদর্শে কোনো পার্থক্য নেই। তবে নিজেদের মতাদর্শের কারণে হিন্দু মহাসভা সমালোচিত হয় এবং সামনে এগোতে পারেনি, কিন্তু এর বিপরীতে আরএসএস সফল হয়েছে এবং ভারতের সবচেয়ে বড় আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ হলো, হিন্দু মহাসভা এই বিষয়টি খেয়াল করেনি যে, তারা যেসব চিন্তাধারার প্রচার করছে, তা জনতা গ্রহণ করতে পারবে কিনা। তারা প্রকাশ্যে এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের মতাদর্শের খোলামেলা প্রকাশ করেছে, হোক সেটা ব্রিটিশ রাজের সমর্থন, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি ঘৃণা, বা জাতিভেদের সমর্থন—প্রতিটি বিষয়েই তারা তাদের মতাদর্শ প্রকাশ করেছে। তবে আরএসএস, যা হিন্দু মহাসভার সাথে তাত্ত্বিক ও চিন্তাভাবনায় পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ, এই ভুলটি করেনি এবং আজও এক শতক পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এই সংবেদনশীল বিষয়গুলোর ওপর আরএসএস কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে আসেনি, বরং অপ্রকাশিত উপায়ে তা প্রকাশ করে চলেছে। যেমন, ডিসেম্বর ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত ধর্ম সংসদ এবং অন্যান্য কিছু সমাবেশে হিন্দু পুরোহিত ও সাধুদের মাধ্যমে এসব ধারণার প্রকাশ ঘটানো হয়েছিল। তবে আরএসএস এই বিষয়গুলোতে প্রকাশ্যে কিছু বলেনি।

কিন্তু অন্যদিকে এটি একটি সত্য যে, জনসাধারণের আবেগের সামনে অস্ত্র তুলে নেওয়ার পরেও আরএসএস কখনোই তাদের মতাদর্শ থেকে পিছু হটেনি, যেমনটি সাধারণত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো করে থাকে। এর ফলে সংঘ আন্দোলনের একটি মতাদর্শিক পরিচিতি তৈরি হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে এই আন্দোলন অনেক হিন্দুর সমর্থন অর্জন করেছে, যারা আজকাল আরএসএসের মতাদর্শের পক্ষে। আর আজ পরিস্থিতি এমন যে, আরএসএস যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এসব বিষয়ে কিছু না

বলে, তবে হিন্দু চরমপন্থীরা পুরো ভারত জুড়ে এই ভাষা ব্যবহার করছে। এইভাবে, যেসব কথা আগে বলাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করা হতো, আরএসএস সেগুলো প্রকাশ্যে না বলে জনগণের মুখে তুলে দিয়েছে।

সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধিত্ব

আরএসএস নিজেকে একটি রাজনৈতিক, সামাজিক বা বিপ্লবী আন্দোলন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং প্রকৃত অর্থে এটি নিজেকে একটি জন আন্দোলনে পরিণত করেছে। সংঘ পরিবার এর ছাতার তলায় সমাজ-জীবনের সব ক্ষেত্র এবং সমাজের সকল স্তরের জন্য বিভিন্ন উপ-সংগঠন গঠন করা হয়েছে। এর ফলে এই আন্দোলনটির জন্য সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছানো এবং সেখান থেকে সমর্থন লাভ করা সহজ হয়ে গেছে। যার ফলস্বরূপ আজ সংঘ পরিবারে কোটি কোটি কর্মী নিয়ে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

মজবুত জনসম্পর্কের নেটওয়ার্ক

সংঘ আন্দোলন তার উপ-সংগঠনসমূহের মাধ্যমে এবং আরএসএস ও অন্যান্য শাখার মাধ্যমে পাড়া-মহল্লার স্তরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে তারা যে কোনো বিষয়কে দেশব্যাপী উত্থাপন করতে চাইলে এই যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা সেই বিষয়টির বার্তা প্রতিটি প্রয়োজনীয় ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। তাই হিজাব, লাউডস্পিকার দিয়ে আজান দেওয়া, কিংবা মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরিত করার মতো বিষয়গুলো পুরো দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে তুলে ধরা হয়।

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে মতাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠন

যে সব আন্দোলন কোনও একটি ব্যক্তিত্বের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, যদি সেই ব্যক্তিত্ব তার আন্দোলনকে একটি মতাদর্শিক ভিত্তি না দিতে পারে, তবে সাধারণত দেখা যায় যে, সেই ব্যক্তিত্বের পর এমন আন্দোলনগুলো শেষ হয়ে যায় বা অন্তত তাদের গুরুত্ব কমে যায়। এর উদাহরণ হিসেবে শিবসেনা তুলে ধরা যেতে পারে। যতদিন বাল ঠাকরের হাতে এই সংগঠনের নেতৃত্ব ছিল, ততদিন পর্যন্ত এটি মহারাষ্ট্রে জনপ্রিয় ছিল এবং এতে কোনো মতবিরোধও ছিল না। কিন্তু যখন এই সংগঠনের নেতৃত্ব বাল ঠাকরের পুত্র উদ্ধব ঠাকরে হাতে আসে, শিবসেনা পরাজয় বরণ করে এবং এতে ভাঙন শুরু

হয়। মতাদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি তার পথ হারাতে থাকে এবং এর জনপ্রিয়তা স্পষ্টভাবে কমে যায়।

এর বিপরীতে, যেসব আন্দোলন ব্যক্তি নয়, বরং মতাদর্শের সাথে সংযুক্ত থাকে, সেগুলোর উপর ব্যক্তির আসা-যাওয়ার কোনো প্রভাব পড়ে না। এটাও একটি সত্য যে, ব্যক্তিত্বের সাথে যুক্ত আন্দোলনগুলো সাধারণত খুব দ্রুত এগিয়ে চলে এবং শীঘ্রই শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে যায়, কিন্তু মতাদর্শিক আন্দোলনগুলোর শীর্ষে পৌঁছানোর পথ তুলনামূলকভাবে ধীর গতির হয়। সংঘ আন্দোলনও কখনো এমন কোনো ব্যক্তিত্ব পায়নি, যিনি নিজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তার ব্যক্তিত্বের শক্তিতে আন্দোলনকে শীর্ষে নিয়ে যান, বরং এই আন্দোলন সবসময় তার মতাদর্শের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থেকেছে। তাই, যদিও এতে নিজেদের প্রকৃত শিখর পর্যন্ত পৌঁছাতে ৯০ বছর লেগেছে, তবুও এই ৯০ বছরে এটি কখনো তার পথ হারায়নি, ব্যক্তিত্বের আসা-যাওয়া থেকে কোনো প্রভাবিত হয়নি, এবং কখনোই এটি পরাজয় বা ভাঙনের শিকার হয়নি; বরং এই ৯০ বছরের যাত্রা ছিল দ্রুতগতির, কিন্তু তা সবসময় স্থিরভাবে শীর্ষের দিকে এগিয়ে গেছে। আজকাল মানুষ বলে, নরেন্দ্র মোদি একটি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং তার প্রভাব এখন আরএসএস-এর থেকেও বড় হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যি কথা হলো, নরেন্দ্র মোদি এই অবস্থানে তার আন্দোলন এবং তার সাথে যুক্ত মতাদর্শ অনুসরণ করে পৌঁছেছেন, এবং প্রকৃতপক্ষে তার অবস্থান ওই আন্দোলনের একজন প্রতিনিধির চেয়ে বেশি কিছু নয়। যখন তার সময় শেষ হবে, তখন তার জায়গায় কেউ অন্য ব্যক্তি আসবে, যেমন যোগী আদিত্যনাথ, এবং আন্দোলন একইভাবে এগিয়ে চলবে।

দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার অধীনে নেতৃত্ব

ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত আন্দোলনের চিন্তাধারা নেতৃত্বের অধীনে থাকে। তাই নেতৃত্বের পূর্ণ অধিকার থাকে যে, তারা যেকোনো সময় তাদের আন্দোলনের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে পারে। শিবসেনা শুরু করেছিল ভূমিপেত্রের ধারণা দিয়ে, পরে বাল ঠাকরে হিন্দুত্ববাদের ধারণা গ্রহণ করেন এবং এখন উদ্ধব ঠাকরে নিজে ধারণা ছেড়ে কংগ্রেসের সেক্যুলার ধারণা গ্রহণ করেছেন। এইভাবে বাস্তবে শিবসেনা একটি উত্তরাধিকারী দল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা তার চিন্তাধারাগত পরিচিতি হারিয়ে ফেলেছে। আরেকটি উদাহরণ হল আকালি দল। এতে সঙ্গত ছিল যে, চিন্তাধারা নেতৃত্বের অধীনে ছিল, তাই নেতৃত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দলের ধারণাতেও পরিবর্তন আসে, যা অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ফলে অনেক

ধারা আলাদা হয়ে যায়। এরপর আকালি দল ৭০ বছর পর আরএসএসের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও শেষ করে দেয়।

এর বিপরীতে, সংঘ আন্দোলনে মতাদর্শ এবং চিন্তা নেতৃত্বের অধীনে থাকার পরিবর্তে, নেতৃত্ব মতাদর্শ এবং চিন্তাধারার অধীনে থাকে। নেতৃত্বের পরিবর্তন হলে এই আন্দোলনের মতাদর্শে কোনো পরিবর্তন হয় না, বরং মতাদর্শে প্রয়োজনীয় বিবর্তনের কাজ নেতৃত্বের পরিবর্তে এই আন্দোলনের চিন্তাবিদদের (বিচারক) হাতে থাকে।[৫৪] এবং নেতৃত্ব ওই চিন্তার অনুসরণ করতে বাধ্য। এর ফলস্বরূপ, সংঘ আন্দোলন তার জীবনের এই পুরো শতাব্দীজুড়ে কখনোই তার চিন্তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি, এবং তাতে কখনো কোনো বিভাজন বা ভাঙন ঘটেনি।

সংখ্যালঘু এবং নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি

সংঘ আন্দোলনের আরেকটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হলো, এটি দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য নিম্নবর্গীয় শ্রেণীগুলিকে নিজেদের সাথে যুক্ত করেছে এবং সংঘ পরিবার এর ছত্রছায়ায় এই শ্রেণীগুলির কল্যাণের জন্য আলাদা সংগঠন গঠন করেছে এবং কেবল মৌখিক প্রচারণার পরিবর্তে এই শ্রেণীগুলির উন্নতির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপও নিয়েছে। এইভাবে সংঘ আন্দোলন নিজেকে তার ঐতিহ্যবাহী উচ্চবর্ণের শ্রেণী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং তখনকার সংঘ আন্দোলনের কর্মীদের অধিকাংশই ছিল নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের নিয়ে গঠিত। যদিও এটি স্পষ্ট যে, নিম্নবর্গীয় শ্রেণীকে নিজেদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া মোটেও সদিচ্ছাপূর্ণ ছিল না, তবুও সংঘ আন্দোলন চমৎকার কৌশলে নিম্নবর্গের মানুষের আবেগকে উসকে দিয়ে এবং তাদের আর্থিক ও সামাজিক শোষণ করে তাদেরকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করছে।

এভাবে আন্দোলনটি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের বাইরে গিয়ে জৈন, বৌদ্ধ এবং শিখদের সামনে নিজেদের তাদের সহায়ক হিসেবে দেখিয়ে তাদেরকেও আন্দোলনের সাথে যুক্ত করেছিল। যদি সংঘ পরিবারের অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব না হয়, তবে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন, আকালি দল আকারে শিখদের অধিকাংশের দেশভাগের পর থেকেই সংঘ আন্দোলনের সাথে ঐক্য ছিল।এটির থেকেও আরও এগিয়ে, সংঘ আন্দোলন যেখানে সম্ভব, মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদেরও নিজেদের

---

[৫৪] এতে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা রয়েছে, সেটি হল এম এস গোলওয়ালকর-এর সময়কাল। এই ব্যতিক্রমও এর জন্য যে গোলওয়ালকর নিজেই এই আন্দোলনের একজন অভ্যন্তরীণ সদস্য ছিলেন এবং তাকে এর নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাই সদস্য ও প্রধান সংগঠকের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার কারণে গোলওয়ালকর আন্দোলনটিকে দৃঢ় আদর্শিক ভিত্তি প্রদান করেছিলেন।

পাশে নেওয়ার চেষ্টা করছে। যেখানে একদিকে খ্রিষ্টানদের গির্জাগুলিকে লক্ষ্য করা হচ্ছে, খ্রিষ্টানদের হেনস্তা করা হচ্ছে এবং তাদের উপর সহিংসতা চালানো হচ্ছে, সেখানে বিজেপি ২০২২ সালে গোয়া রাজ্যে খ্রিষ্টান সংগঠনগুলোর সঙ্গে জোট গঠন করেছিল, যাতে এই রাজ্যে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে পারে।

এটি মাত্র নয়, বরং সংঘ আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু শ্রেণীকে (ব্রেলভী এবং অন্যান্য ভ্রষ্ট সুফি শ্রেণী), যারা গরু জবাই করার বিষয়ে, অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্বে এবং অন্যান্য কিছু তত্ত্বে হিন্দুদের সাথে সঙ্গতি রাখে, বা অন্য কথায়, তারা সেই শ্রেণী যারা হিন্দুত্ববাদী তত্ত্ব অনুযায়ী নিজেদের জাতীয় ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার পুরো যোগ্যতা রাখে, তাদের একত্রিত করার জন্য চেষ্টা করছে। অতীতে এ ধরনের বহু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলোতে এসব শ্রেণীর উলামাদের পক্ষ থেকে গরু জবাইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার এবং হিন্দুদের উৎসবে মুসলমানদের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। আগস্ট ২০২২ সালে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ধর্মীয় সংহতি নামক একটি সম্মেলন আয়োজন করেন, যেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে "অল ইন্ডিয়া সুফি সাজ্জাদানাশিন কাউন্সিল"কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই কাউন্সিল সম্মেলনের সময়ে বিজেপি সরকারের পূর্ণ সমর্থন জানায় এবং দাবি করে যে মুসলিম সংগঠন "পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া"-র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক। পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া বর্তমানে মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন, যা মুসলমানদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং রাস্তায় নেমে আসে। বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র নুপূর শর্মার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবমাননার পর, গোটা ভারতে শুধুমাত্র এই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদী আহ্বান জানানো হয়েছিল।

কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠা গণআন্দোলন

এই আন্দোলনের আরেকটি বিশেষত্ব হলো, এটি সংঘ পরিবারের সাথে সংযুক্ত সমস্ত সংগঠনগুলোকে আরএসএস এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে আনেনি, বরং তাদের একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা নিয়ে একত্রিত করে স্বাধীন সংগঠনিক অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে।

এর ফলে একটি সুবিধা হলো যে, কোনো একটি সংগঠনের ওপর আইনগত চাপ অন্যান্য সংগঠনগুলোকে প্রভাবিত করে না। এবং আরেকটি সুবিধা হলো, এত বড়

আকারে কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে না থাকার কারণে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয় না।

এই পদ্ধতিটি সংঘ আন্দোলনকে একটি জনগণভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলতে সাহায্য করেছে। যে কোন গোষ্ঠী, যারা নাগরিক আন্দোলনের ধারণা এবং চিন্তাধারা নিয়ে একমত, তারা তাদের ক্ষমতার সীমার মধ্যে একটি আলাদা সংগঠন তৈরি করে তা সংঘ পরিবারের ছায়াতলে নিয়ে আসতে পারে। এই কারণে, যেখানে ভারতের কেন্দ্রীয় স্তরে সংঘ পরিবারের সাথে বেশ কয়েকটি সংগঠন যুক্ত রয়েছে, সেখানে আঞ্চলিক স্তরে সংঘ পরিবারের সাথে যুক্ত মতবাদভিত্তিক সংগঠনের সংখ্যা শতাধিক হয়ে গেছে।

মোদি সরকারের ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিদিন নতুন কোন না কোন সংগঠন অথবা নতুন কোনো হিন্দু চরমপন্থী ব্যক্তিত্ব সামনে আসছে। স্থানীয় পর্যায়ে পরিচিত হিন্দু ব্যক্তিত্বরা অথবা ক্ষমতা ও প্রভাবের বাসনায় হিন্দু সরকার থেকে সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন সংগঠন গঠন করে চলেছেন এবং তাদের সংগঠনগুলোতে সদস্য সংগ্রহের জন্য বেকার বা কম আয়ের হিন্দু যুবকদের একটি দল সব জায়গায় পাওয়া যায়, যাদের অর্থনৈতিক শোষণ করা হয় এবং তাদের হাতে তলোয়ার ধরিয়ে দিয়ে এবং ইসলাম-বিরোধী গানে নাচাতে নাচাতে মনস্তাত্ত্বিক মাদক দেওয়া হয়, যার ফলে তারা তাদের আর্থিক সমস্যাগুলো ভুলে গিয়ে নিজেদের একটি বড় উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত মনে করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংঘ আন্দোলনের দুর্বলতা

ঐক্যবদ্ধ হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধোঁকা

সংঘ আন্দোলন যদিও বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে বড় আন্দোলন হয়ে উঠেছে এবং তাদের সফল কৌশলগুলোর কারণে এই মুহূর্তে এটি শীর্ষে রয়েছে, তবে এই আন্দোলন যে জাতীয়তাবাদী ধারণার পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তা নিজেই অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণার একটি ভিত্তি হলো সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তা, যার অধীনে শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু, দলিত এবং আদিবাসীরা এক হিন্দু জাতির অংশ, বরং হিন্দু ধর্মের বাইরে শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈনও এই একীভূত হিন্দু জাতির অংশ। এই ধারণাটি না তো ঐতিহাসিকভাবে সঠিক এবং না সংঘ আন্দোলনের

ভবিষ্যত লক্ষ্যগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে এই সবই আলাদা আলাদা জাতি ছিল এবং নিজেদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে বাস করত। "হিন্দু মতবাদ" শব্দটি তো ইংরেজদের মাধ্যমে এখানে এসেছিল, যেখানে তারা এখানে বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলিকে একটি নাম দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করেছিল, আর তার আগে হিন্দু ধর্মের কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

নিজেদের ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য অনুযায়ীও স্পষ্ট যে, সংঘ আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ হিন্দু জাতিয়তাবাদের নামে শান্তিপূর্ণ শাসন চায়, যেখানে বাকি সবাই ব্রাহ্মণের অধীনে থাকবে। এটি দলিতদের অধিকার দেওয়ার, তাদের সমাজে উন্নতি করার এবং জাতিভেদ প্রথা দূর করার কথা বলে, কিন্তু একই সাথে এর লক্ষ্য হচ্ছে মনুস্মৃতিকে দেশের আইন হিসেবে প্রবর্তন করা, যার ভিত্তি হলো জাতি অনুযায়ী অধিকার ও কর্তব্যের বিভাজন। একদিকে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু জাতিয়তাবাদে শিখ, বৌদ্ধ ও জৈনকে হিন্দু জাতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, অন্যদিকে শঙ্করাচার্যকে তার ইতিহাসের বড় নায়ক হিসেবে মানা হয়, কারণ তিনি উপমহাদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব শেষ করেছেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের একটি বড় অংশকে হিন্দু করেছেন। তারা ঐক্যবদ্ধ হিন্দু জাতিয়তাবাদের কথা বলে, কিন্তু হিন্দুধর্মে বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করতে পারে না। তারা ঐক্যবদ্ধ হিন্দু জাতিয়তাবাদের কথা বলে, কিন্তু কখনোই কোনো নিম্ন জাতিকে শাসক হিসেবে সহ্য করতে পারে না। কেউ এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বলতে পারে যে, ইতিহাসে প্রথমবার ২০২২ সালে বিজেপি সরকারের অধীনে এক নতুন জাতির আদিবাসী নারীকে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ভারতে রাষ্ট্রপতির পদ সবসময় একটি প্রতীকী পদ হিসেবে রয়েছে এবং বেশিরভাগ সময় এই পদে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যকে নিয়োগ করা হয়, যাতে সংখ্যালঘুদের মন জেতা যায় এবং বিশ্বকে দেখানো যায় যে আমরা সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যপূর্ণ আচরণ করি না।

এটিও অভিযোগ করা হতে পারে যে, সংঘ আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে একটি বড় অংশ নিম্ন জাতির হিন্দুদের রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে, তাদের মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের অর্থনৈতিক শোষণ করা হয়। সংঘ আন্দোলনে নিম্ন জাতির হিন্দুদের রাখা হয় যেন তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাদের বলি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথম সারিতে এরা থাকেন। পুলিশ এবং মুসলিমদের মোকাবিলায় শুধু এদেরকেই সামনে আনা হয়। এরা গ্রেফতার হন, নিহত হন। হত্যা পুলিশ গুলিতে হোক বা মুসলিমদের পাল্টা হামলায়,

লক্ষ্য থাকে শুধু নিম্ন জাতির হিন্দুদের। অথচ উচ্চ জাতির হিন্দুরা এই ধরনের ঘটনায় কখনোই সামনে আসেন না।

সরকারি শক্তির উপর নির্ভরশীলতা

সংঘ আন্দোলনের পূর্ণ ইতিহাস সাক্ষী যে, এই আন্দোলন সরকারকে প্রতিহত করতে কখনোই আগ্রহী হয়নি এবং এই আন্দোলন তখনই তার শক্তি প্রকাশ করেছে এবং তার প্রকৃত রূপ স্পষ্ট করেছে যখন এটি সরকারী ক্ষমতা লাভ করেছিল। দাঙ্গার ইতিহাসও একই কথা বলছে যে, হিন্দুরা দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে সেই সময়ে এবং এমন রাজ্যে যেখানে তারা বিশ্বাস করত যে, যদি রাজ্য সরকার তাদের সাথে না থাকে তবে অন্তত রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের পক্ষে থাকবে। এটাই কারণ যে, ২০১৪ সালে মোদীর সরকারের ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের সর্বত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা এবং তাদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এটি একটি ভুল ধারণা দূর করে যে, অনেকেই বলেন, ভারতের বিজেপি সরকারের অধীনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যা কিছু হচ্ছে, তা হচ্ছে কেবল বিজেপি ক্ষমতায় থাকতে পারে বলে এবং এটি সবই নির্বাচনে জয়ী হওয়ার কৌশল। যদিও বিষয়টি সম্পূর্ণ তার বিপরীত, বিজেপির জন্য ক্ষমতায় থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সংঘ আন্দোলন মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে। তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে করা কর্মকাণ্ডগুলো চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিজেপির ক্ষমতায় থাকা প্রয়োজন, এটি কেবল ক্ষমতায় থাকার কৌশল নয়। এমন মনোভাবের ক্ষতি হলো যে, এভাবে পুরো ঘটনাকে খুব সীমিত দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং একে শুধু নির্বাচন ও রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং এই সত্যটি উপেক্ষিত হয় যে, এটি আসলে ভারতের হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর এবং মুসলমানদেরকে ভারত থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার পদক্ষেপ, যা অস্থায়ী বা সময়সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি চলবে যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

বাহাদুরি, ধৈর্য এবং আত্মত্যাগের মতো অনুভূতির অভাব

সরকারী শক্তির উপর নির্ভরশীলতার দুর্বলতা আরেকটি দুর্বলতা সামনে আনে, সেটা হলো সংঘ আন্দোলন থেকে দেশের লোকেরা শক্তিশালীদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়ার সাহস পায় না। তারা তখনই বাঘের মতো হয়ে ওঠে যখন তারা নিশ্চিত থাকে যে প্রতিপক্ষ দুর্বল এবং প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্য নেই। যখন তারা নিশ্চিত থাকে যে, রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের পাশে থাকবে অথবা অন্তত তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করবে না। ব্রিটিশ

শাসনের বিরোধিতা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। এর পাশাপাশি, স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে আরএসএস কর্মীদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের পর, সব সরকারি দাবী মেনে নেওয়ার ঘটনাও এরই একটি উদাহরণ। বিষয়টি শুধু সরকারের নয়, যখন মুসলিম বিরোধী পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া বা প্রতিশোধের ঝুঁকি তারা দেখতে পায়, তখন তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ২০২২ সালের জাহাঙ্গিরপুরী দাঙ্গায় যখন দাঙ্গাকারীরা পুলিশি নিরাপত্তায় মুসলমানদের এলাকায় মসজিদের সামনে আওয়াজ করছিল এবং মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করছিল, তখন ওই দাঙ্গাকারীরা অন্যদিক থেকে মুসলমানদের একটি দলকে প্রতিশোধ নিতে আসতে দেখে, তারা পালিয়ে যায় এবং কাউকেই দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার সাহস হয়নি। একইভাবে, বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র নুপুর শর্মা যখন টিভি চ্যানেলে নবীজির প্রতি অবমাননা করেন, তখন ইন্টারনেটে কিছু হুমকির কারণে তার কলিজা শুকিয়ে যায় এবং সে বাড়িতে লুকিয়ে বসে থাকে এবং ইন্টারনেটে সবাইকে মিনতি করতে থাকে, যেন কেউ তার বাড়ির ঠিকানা কাউকে না জানায়, তার জীবন বিপদের মধ্যে রয়েছে।

এই বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে হিন্দু মৌলবাদীরা আসলে অত্যন্ত ভীরু মানুষ। তাদের মধ্যে তো এই সাহসও নেই যে, সমকক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে পারেন, এই স্থিরতাও নেই যে কঠিন এবং পরীক্ষার পরিস্থিতিতে নিজেদের চিন্তাধারা ও দাবির প্রতি অবিচল থাকতে পারবেন, আর এই ত্যাগের মানসিকতাও নেই যে, তারা নিজেদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবেন।

গেরুয়া সন্ত্রাসী হিন্দু পণ্ডিত ইয়েতি নরসিংহানন্দ অনেক সংখ্যক হিন্দুকে একত্রিত করে তাদের শপথ করান যে, তারা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করবে এবং এর জন্য তারা মরবে এবং মারবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তিনি নিজেও জানেন যে, যদি সরকারের সমর্থন থাকে, তবে মারার জন্য সবাই প্রস্তুত থাকে, কিন্তু মরার জন্য, খোদ তার নিজেরও, কেউই সাহসী নয়।

শিখ-হিন্দু সম্পর্ক

এই ধারণা অনুযায়ী, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং শিখদের হিন্দু পরিচয়ে অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য এক দিকে হল, এই তিনটি ধর্মকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সাথে একত্রিত করা, তবে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে হিন্দুধর্মে একীভূত করা এবং তাদের অবস্থান হিন্দুধর্মের একটি উপধারা হিসেবে পরিণত করা। জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে তারা কিছুটা সফল হয়েছে, এবং জৈন ধর্মের অনুসারীরা বর্তমানে ভারতের একটি নিচু জাতির হিন্দুরূপে গণ্য হন, যেখানে

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের অবস্থা এখন প্রায় হিন্দুধর্মের একটি উপধারার মতো। তবে শিখদের বিষয়টি কিছুটা আলাদা, এবং তারা তাদের পৃথক পরিচয় ত্যাগ করতে রাজি নয়। এই কারণে, সংঘ আন্দোলন শিখ-হিন্দু ঐক্যকে তাদের অগ্রাধিকারে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

হিন্দু সংগঠনগুলোর ইতিহাস অধ্যয়ন করার পর শিখদের সম্পর্কে দুটি বিপরীত মনোভাব দেখা যায়। একদিকে, একল তখত শিখদের শিখ সঙ্গতে যোগদান নিষিদ্ধ করে এবং বলে যে এর মাধ্যমে আরএসএস শিখদের হিন্দুদের মধ্যে মিশিয়ে দিতে চায়, তবে অন্যদিকে, আকালি দল, যার অধীনে একল তখত কাজ করে, স্বাধীনতার পর থেকেই আরএসএসের সাথে রাজনৈতিক জোটে রয়েছে।

এ থেকে ধারণা হয় যে শিখ সম্প্রদায় জৈন এবং বৌদ্ধদের বিপরীতে সহজেই কোনো আলাদা আন্দোলনের জালে আটকা পড়বে না, বরং তারা যেকোনো অবস্থাতেই তাদের স্বতন্ত্র পরিচিতি বজায় রাখতে চায়। তবে এই একক স্বতন্ত্র পরিচিতির বিষয়টি ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোতে, বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তারা সংঘ আন্দোলনের সমর্থক।

এটি একটি ভুল ধারণা যে, শিখদের মধ্যে সাধারণভাবে হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা রয়েছে, আসলে এটি সঠিক নয়। হিন্দুদের প্রতি ঘৃণার অনুভূতি শুধুমাত্র খালিস্তান আন্দোলনে[৫৫] যুক্ত শিখদের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত শিখরা সংখ্যালঘু। ১৯৮৪ সালের অপারেশন ব্লু স্টারের পর থেকে শিখদের মধ্যে এই আন্দোলনের সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও এই আন্দোলনের সমর্থকরা আজও সংখ্যালঘু, আর মেজরিটি আজও আকালি দল এবং তার বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে রয়েছে, যারা স্বাধীনতার পর থেকেই সিঙ্ঘ আন্দোলনের সাথে ছিল। যদিও এখন কেন্দ্রীয় আকালি দল বিজেপির সাথে জোট ছেড়ে দিয়েছে, তবে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে,

[৫৫] খালিস্তান আন্দোলন শিখদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ খালিস্তান প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানানো একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। শিখদের জন্য আলাদা দেশ গঠনের দাবি ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগ দ্বারা লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে শিখ সংগঠন শিরোমণি আকালি দল থেকে উঠে আসে, যারা পাকিস্তানের দাবিকে ঐতিহাসিক শিখ এলাকাসমূহ দখল করার চেষ্টা হিসেবে দেখছিল। ভারত বিভাগের পর আকালি দল 'পাঞ্জাব প্রদেশ আন্দোলন' শুরু করে এবং খালিস্তান আন্দোলন কিছুটা স্তব্ধ হয়ে যায়।

১৯৭০ সালে দাভিন্দর সিংহ পরমার এবং আকালি দল থেকে সম্পর্কিত একজন রাজনীতিবিদ জগজিৎ সিংহ চৌহান লন্ডনে একটি প্রেস কনফারেন্সে খালিস্তান আন্দোলনের ঘোষণা করেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর জগজিৎ সিংহ চৌহান পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ চৌধুরী জহুর এলাহি'র আমন্ত্রণে পাকিস্তান যান। সেখানে চৌহান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চৌহানের মতে, ভুট্টো খালিস্তান আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থন এবং সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন এবং এমনকি বলেন যে, নতুন স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার 'নানকানা সাহেব' হবেন এবং লাহোরসহ অধিকাংশ পাকিস্তানি পাঞ্জাব খালিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

তাদের মধ্যে কোনো ধরণের আদর্শিক অমিল সৃষ্টি হয়েছে, বরং এই অমিল এবং বিচ্ছিন্নতা মূলত রাজনৈতিক প্রকৃতির এবং আকালি দলের অন্যান্য গোষ্ঠী বিজেপির সাথে জোট করার জন্য কেন্দ্রীয় আকালি দলের জায়গা নেওয়ার জন্য উন্মুখ।

বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-ধারকদের সাথে যুক্ত হওয়ার গুরুত্ব

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর অধ্যয়ন থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে, যখন একটি মতাদর্শের জ্ঞান একটি সংগঠন হাতে নিয়ে নেয়, তখন পরবর্তী সংগঠনগুলো সেই সময়ে সেই মতাদর্শের সাথে শক্তিশালীভাবে যুক্ত হতে পারে, যদি তারা নিজেকে সেই জ্ঞান-ধারকের সাথে যুক্ত করে নেয়। তবে এটা তখনই সম্ভব যদি প্রথম সংগঠনটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একটি শক্তিশালী সংগঠন সামনে এসে সেই মতাদর্শের জ্ঞান নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। যেমন, হিন্দু মহাসভা'র দুর্বলতার পর আরএসএস হিন্দুত্ববাদের জ্ঞান নিজেদের হাতে নেয়। তবে যখন কোনো মতাদর্শের জ্ঞান একটি শক্তিশালী দলের হাতে থাকে, তখন পরবর্তী ছোট দলগুলো সেই সময় সেই মতাদর্শের সাথে একনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতে পারে, যদি তারা নিজেদের সেই জ্ঞান ধারকের সাথে যুক্ত করে নেয়, যেমনটি সংগঠনগুলো সংঘ পরিবার থেকে করেছে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক পার্থক্যের কারণে বা নিজ ক্ষমতা ও মর্যাদার জন্য, অথবা কারো অধীন না হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আলাদা গ্রুপ গড়ে তোলা দলগুলো সাধারণত মতাদর্শের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে যুক্ত থাকতে পারে না, বরং পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সহজেই নিজেদের পথ পরিবর্তন করে ফেলে, যেমনটা সংঘ পরিবার থেকে আলাদা হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ ধারণকারী দলগুলো বিশেষ করে শিবসেনার ক্ষেত্রে দেখা যায়। অথবা তারা পুরোপুরি তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, যেমনটি সুব্রামানিয়ান স্বামীর জনতা পার্টি বা বলরাজ মাধোক এবং প্রফুল গৌরাদিয়া'র অখিল ভারতীয় জনসংঘের ক্ষেত্রে হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিন্দুত্ববাদের সাথে সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত বেদান্ত

অদ্বৈত বেদান্ত হিন্দুধর্মে একটি কেন্দ্রীয় স্থান অধিকারী একটি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দর্শন, যা বেদান্ত দর্শনের একটি শাখা। বেদান্ত দুটি শব্দের সংমিশ্রণ- 'বেদ' এবং 'অন্ত' থেকে উদ্ভূত। 'বেদ' হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত, আর 'অন্ত' শব্দের মানে হলো শেষ। সুতরাং, বেদান্তের অর্থ হলো বেদের শেষ বা বেদের সারাংশ। বেদান্তের দর্শনকে বেদের আসল জ্ঞান বা বেদের জ্ঞানের সারাংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বেদে এমন কিছু মন্ত্র (শ্লোক) রয়েছে যেগুলোর ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ বেদান্ত দর্শনের মাধ্যমে করা হয়েছে, তবে বাস্তবে বেদান্ত দর্শনের কোনো উল্লেখ বেদে নেই। বেদান্তের সমস্ত জ্ঞান মূলত 'উপনিষদ'[৫৬] থেকে আহৃত। এবং যেহেতু উপনিষদ বেদের শেষ অধ্যায়, তাই এই দর্শনগুলোকে বেদান্ত বলা হয়। উপনিষদের পাশাপাশি বেদান্তের দর্শনে কিছু সংযোজন করা হয়েছে 'ব্রহ্মসূত্র'[৫৭] এবং 'ভগবদ্গীতা'[৫৮] থেকেও। বেদান্তে এই তিনটিকে 'প্রস্তানত্রয়ী' (Parasthanatrayi) হিসেবে মান্য করা হয়, অর্থাৎ এর মূল উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এভাবে "অদ্বৈত"ও দুটি শব্দের সমন্বয়। এবং "অ" সংস্কৃতে না বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "দ্বৈত" আসলে "দ্বিত" যা সংস্কৃতে একটি

---

[৫৬] উপনিষদ (Upanishad) হল সেই রচনা-সমষ্টি, যা দর্শন এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে। এবং এটি বেদের পরবর্তী সময়ে লেখা হয়। এগুলোকে বেদের শেষ সংযোজন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বেদের শেষ অধ্যায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই রচনাগুলোর মূল বিষয় আধ্যাত্মিকতা, যেখানে আত্মার উন্নতির উপায় যেমন ধ্যান, আত্মজ্ঞান, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[৫৭] ব্রহ্মসূত্র (Brahma Sutras) ২য় শতাব্দীর এক প্রাচীন রচনা, যা মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের লেখা। এই রচনা উপনিষদের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাভাবনাগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ করে।

[৫৮] ভগবদ্গীতা (Bhagavad Gita) হল হিন্দু ধর্মের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, যা মহাভারতের অংশ এবং মূলত পান্ডব রাজকুমার অর্জুন এবং তার গুরু কৃষ্ণের মধ্যে যুদ্ধের প্রাক্কালে হওয়া এক আলাপচারিতা। অর্জুন হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বাঁচতে যুদ্ধ থেকে পালানোর চিন্তা করেন এবং কৃষ্ণের কাছে উপদেশ কামনা নিজেকে ধর্ম এবং কর্মের সঠিক পথ অনুসরণের কথা বলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য পালন করার জন্য এবং নিজের ধর্ম রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেন, এবং এক যুদ্ধবীর (ক্ষত্রিয়) হিসেবে তার কর্তব্য পালন করার কথা বলেন। বেদান্তের দার্শনিকরা এই আলোচনা সমূহকে এক ধরনের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে তারা আত্মা (রুহ) ও ঈশ্বর (খোদা) এর সম্পর্কের দার্শনিক তত্ত্ব গঠন করেছেন।

প্রচলিত শব্দ, অর্থাৎ কাউকে দুটি হিসেবে ধরা বা দ্বৈতবাদ বা দ্বিত্ববাদ।[৫৯] (এমন একটি বিশ্বাস, যেখানে দুটি স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় (যেমন: আত্মা ও পদার্থ), অথবা দুই ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস।) এইভাবে "অদ্বৈত" এর অর্থ হলো দ্বৈতবাদ বা দ্বিত্ববাদকে অস্বীকার করা, যাকে ইংরেজিতে "non-dualism" বলা হয়।[৬০]

এই দর্শনের সারাংশ হলো, মহাবিশ্বে একমাত্র সত্য হল ব্রাহ্মণ (ঈশ্বর)।[৬১] মানব আত্মা (রুহ)ও তারই একটি অংশ এবং মহাবিশ্বের সবকিছুই আসলে সেই এক অস্তিত্বেরই অংশ। আর যা কিছু দেখা যায়, তা শুধুমাত্র মায়া (মিথ্যা) এবং সেই হাকিকতের তাজাল্লি বা প্রতিফলন।[৬২] অন্য কথায়, সৃষ্টির সমস্ত কিছু স্রষ্টার অস্তিত্বের একটি অংশ এবং তার পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, এবং মহাবিশ্বে যা কিছু দেখা যায়, তা কোন আলাদা অস্তিত্ব নয়, বরং স্রষ্টার অস্তিত্বেরই প্রকাশ।

এই দর্শনকে সঠিকভাবে গঠন করেছিলেন অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মীয় নেতা আদি শংকরাচার্য। এটি সেই সময়কার কথা, যখন ভারতকে মুসলিমরা ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ করছিল। অষ্টম শতাব্দীতেই মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেছিলেন এবং তার পরেও আক্রমণ অব্যাহত ছিল। সে সময় হিন্দুধর্ম কোন একটি সুনির্দিষ্ট ধর্ম ছিল না। বরং পুরো উপমহাদেশে শত শত ছোট ছোট রাজ্য ছিল, যেখানে দেবতারাও আলাদা ছিল এবং সেখানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও ছিল ভিন্ন। হিন্দুদের প্রাচীন পবিত্র বৈদিক গ্রন্থসমূহ ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে বর্ণিত নির্দেশাবলীতে বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল এবং প্রতিটি অঞ্চলের ব্যাখ্যাও ছিল ভিন্ন। আদি শংকরাচার্যের আসল কৃতিত্ব ছিল যে, তিনি উপমহাদেশে ছড়িয়ে থাকা এই শত শত ধর্মকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি শক্তি গঠন করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি অদ্বৈত দর্শন তৈরি করেছিলেন এবং সেটিকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রেখে সবাইকে এই দর্শনের ওপর একত্রিত হতে আহ্বান করেছিলেন।অদ্বৈত -এর দর্শন প্রথম দিকে একটি খাঁটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মনে হতে পারে, কিন্তু এই দর্শন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এজন্যই মূলত এই দর্শনের ফলে শঙ্করাচার্যের মূর্তিপূজার বিরোধিতা করা উচিত ছিল, কিন্তু

---

[৫৯] দ্বৈত, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

[৬০] অদ্বৈত বেদান্ত (Advaita Vedanta) -সঙ্গীতা মেনন (২০১২), ইন্টারনেট এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোসফি"

[৬১] ব্রাহ্মণ (Brahman) শব্দটি হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণী ব্রাহ্মণদের বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও এর সাথে ঈশ্বর ব্রহ্মের সম্পর্ক নেই। ব্রাহ্মণ হল একটি ধর্মীয় শ্রেণী, যারা অত্যন্ত পবিত্র এবং সর্বোচ্চ সম্মানিত হিসেবে বিবেচিত। সাধারণ হিন্দুরা এই শব্দের পরিবর্তে ঈশ্বরের জন্য "ঈশ্বর" (Ishvara) শব্দ ব্যবহার করেন।

[৬২] অদ্বৈত বেদান্ত: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন (Advaita Vedanta: An Introduction) -অরবিন্দ শর্মা (২০০৭)

যেহেতু এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক না হয়ে রাজনৈতিক ছিল, তাই তিনি মূর্তিপূজার বিরোধিতা না করে বরং তার সমর্থন করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও দর্শনের বিশারদ এবং সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ভি এস ঘাতে (V.S. Ghate) একটি প্রবন্ধে শঙ্করাচার্যের মূর্তিপূজার সমর্থনে একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন:

"নিজের উন্নতির এক নির্দিষ্ট স্তরে মূর্তিপূজা আমাদের স্বাভাবিক প্রয়োজন। যখন ধর্মীয় আত্মা পরিণত ও পূর্ণতা লাভ করে, তখন মূর্তিপূজার প্রয়োজন আর থাকে না। যখন ধর্মীয় আত্মা পরিণত ও পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন চিহ্ন এবং প্রতীকগুলো ত্যাগ করা উচিত।"[৬৩]

শঙ্করাচার্য্যের পরবর্তী যুগে, যখন পুরো ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন সেই সময়কার হিন্দু চিন্তাবিদরা ভারতীয় প্রথা এবং রীতিনীতিকে ইসলামী প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য আধ্যাত্মিকতার দর্শনকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, এবং পুরো ভারতজুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন রীতিনীতিকে মতবাদ এবং ধর্মের আকারে রূপান্তরিত করেন। এইভাবে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভারতের স্থানীয় ধর্মগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

যখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন শুরু হলো, তখন ব্রিটিশরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে পশ্চাদপদ, অপ্রগতিশীল এবং পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি শত্রুতা সৃষ্টির মাধ্যমে হিন্দুদের মধ্যে 'নিকৃষ্টতার অনুভূতি' (inferiority complex) ঢুকিয়ে দিল। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু চিন্তাবিদরা বৈদান্তের 'মানবপ্রেম' এবং 'সবার মধ্যে একাত্ম করে নেওয়া'র ধারণাকে পরিচিত করালেন, যা এখন আধুনিক বৈদান্ত বলে পরিচিত। অদ্বৈত বৈদান্তকে হিন্দুধর্মের মূল দার্শনিক চিন্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং আধুনিক বৈদান্তের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদর্শন করার প্রচেষ্টা করা হয়।

তার পাশাপাশি, যে পশ্চিমা সভ্যতা এখানে শক্তি ও দাপটের সাথে এখানে শাসন করেছিল, এটি তার প্রভাব-প্রতিপত্তি এখানকার সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর ফেলেছিল এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে স্থানীয় ধর্মসমূহ এবং তাদের কিছু ধারণা যেমন মূর্তিপূজা এবং জাতিভেদ ইত্যাদি থেকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে তীব্র বিরক্তি সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে হিন্দু ধর্মের টিকিয়ে থাকা নিয়েও গুরুতর বিপদ সৃষ্টি হয়েছিল।

---

[৬৩] এন্ড অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক, ফোর্থ এডিশন, আর্টিকল: শংকরাচার্য (End of Religion and Ethic, Fourth Edition, Article: SankarAcharya) -বাই ভি. এস. ঘাটে, উর্দু অনুবাদ: তারিখে দাওয়াত ও আজিমত, প্রথম খণ্ড, মাওলানা আবু হাসান আলী নদবি, পৃষ্ঠা: ২৫

এই অবস্থায়, হিন্দু চিন্তাবিদরা হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং হিন্দুধর্মের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য আধুনিক বেদান্তের মতবাদকে প্রচার করেছিলেন।

এই চিন্তাবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন বাংলা অঞ্চলের এক যুবক সন্ন্যাসী নরেন্দ্র নাথ দত্ত, যিনি পরবর্তীতে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন। বিবেকানন্দ হিন্দু ধারণাগুলিকে পশ্চিমা দুনিয়ায় পরিচিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার মাধ্যমে হিন্দুধর্ম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতের দর্শনকে সমস্ত ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করেছিলেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি যে, অদ্বৈতের দর্শন বেদান্তের সাতটি দর্শনের মধ্যে একটি। এই সাতটি দর্শনের মধ্যে তিনটি দর্শন মৌলিক গুরুত্ব রাখে, আর বাকিগুলোকে তাদের উপশাখা বলা যেতে পারে। এই মৌলিক দর্শনগুলো হলো—

এক. অদ্বৈত বেদান্ত (Advaita Vedanta) অর্থাৎ দ্বৈততত্ত্বের অস্বীকার (-non dualism): সৃষ্টির সত্তা স্রষ্টার অস্তিত্বেরই একটি অংশ এবং তার আলাদা কোনো সত্তা নেই।

দুই. দ্বৈত বেদান্ত (Dvaita Vedanta) অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দ্বৈতত্ব (dualism): সৃষ্টির সত্তা স্রষ্টার অস্তিত্বের অংশ নয়, বরং উভয়ের আলাদা আলাদা সত্তা রয়েছে। তবে সৃষ্টির অস্তিত্ব কেবল স্রষ্টার কারণেই রয়েছে।

তিন. ভেদাভেদ (Bhedabheda) অর্থাৎ সত্ত্বা আলাদাও, আবার একও। এই দার্শনিক মতবাদটি অদ্বৈত এবং দ্বৈত তত্ত্বগুলিকে একত্রিত করে। তবে প্রকৃতপক্ষে 'সত্ত্বা আলাদাও, আবার একও' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, এর ব্যাখ্যা এই দর্শনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি দার্শনিক আলাদা আলাদাভাবে দিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে ব্যাখ্যাটি দেওয়া হয়, তা হলো যে যদিও সৃষ্টির সত্তা স্রষ্টার অস্তিত্ব থেকে আলাদা, তবুও তা স্রষ্টার অস্তিত্ব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, তাই দেখতে হয়তো সৃষ্টির অস্তিত্ব আলাদা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি স্রষ্টার অস্তিত্বেরই একটি অংশ।

স্বামী বিবেকানন্দ এই দর্শনগুলোকে পৃথক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং এই বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন যে, এগুলো আসলে আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর এবং অবশেষে অদ্বৈত দর্শনের স্তর। বিবেকানন্দের ধারণাগুলো আধুনিক

বেদান্তের ভিত্তি এবং এই ধারণাগুলো আধুনিক এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

যদিও হিন্দু ধর্মবিশ্বাস এবং রীতির মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে, তথাপি বিবেকানন্দের প্রচেষ্টার মাধ্যমে অদ্বৈত বেদান্তের আধুনিক রূপ হিন্দু চিন্তাধারায় প্রাধান্য লাভ করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মের পুনর্জীবন ঘটানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নাম এবং আজকের দিনে যে কেউ হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তার জ্ঞান অর্জন করে থাকেন, তা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে স্বামী বিবেকানন্দ থেকে নেওয়া। তবে বিবেকানন্দকে হিন্দু ধর্মের মুজাদ্দিদ (পুনর্জীবনকারী) বলার চেয়ে 'মুছাদ্দিদ' (আধুনিকীকরণকারী) বলা বেশি সঠিক হবে। কারণ, পশ্চিমা সভ্যতা এবং আধুনিক শিক্ষা কারণে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম শেষ হয়ে যাচ্ছিল এবং তার মূল ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আধুনিক মনের কাছে তাতে কোনো আকর্ষণ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে, বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মকে পুনরায় জীবিত করতে এবং পশ্চিমে তা গ্রহণযোগ্য করতে, এতে পশ্চিমা চিন্তা-ভাবনা এবং মতাদর্শের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন এবং প্রচলিত হিন্দু ধারণাগুলির নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, যা আধুনিক পশ্চিমা তত্ত্ব এবং চিন্তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন এবং সেখানে তার শত শত উপদেশে হিন্দু দর্শন, বিশেষ করে অদ্বৈত দর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অদ্বৈত দর্শনের নতুন ব্যাখ্যার পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দের যে কাজটি পশ্চিমে সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত হয়েছে, তা হলো অদ্বৈত দর্শনের আধ্যাত্মিক স্তর অর্জনের জন্য যোগাভ্যাসের[৬৪] অনুশীলনগুলো পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই যোগাভ্যাসগুলো পরবর্তীতে পুরো পশ্চিমে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে হিন্দু সভ্যতার অবমাননা এবং আধুনিক শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের হিন্দু ধর্ম ও রীতিনীতি থেকে নিরাশার ফলে হিন্দুধর্মের টিকে থাকার প্রশ্ন ওঠে, যার ফলে হিন্দু জাতীয়তার ধারণা জন্ম নেয়। এই সময়ে বেদান্ত পশ্চিমা জাতি ও হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের চোখে হিন্দুধর্মের আত্মার প্রতীক হয়ে ওঠে, যখন অদ্বৈত বেদান্তকে হিন্দুধর্মের জটিল প্রকৃতি বুঝতে একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে দেখা হতে থাকে।

---

[৬৪] যদিও যোগ ব্যায়াম বা যোগাভ্যাসের মূল উর্দু শব্দটি হল 'যোগ/ইয়োগ (یو گ)। এই শব্দটি ইংরেজি ভাষায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর এর শেষে একটি "আ" যুক্ত হয়ে ইয়োগা (یو گا) পরিচিত হয়েছে। এর বিশেষজ্ঞকে যোগী বলা হয়। একই শব্দকে ভারতের কিছু অন্যান্য উপভাষায় 'জোগ' বলা হয় এবং এর বিশেষজ্ঞকে জোগী।

অদ্বৈত বেদান্তের এই ধারণা এমন একটি জাতীয়তাবাদী তত্ত্বের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে, যা হিন্দুদের খ্রিস্টান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে পারতো।

অদ্বৈতবাদ (অদ্বৈত দর্শন) একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দর্শন হলেও, এই দর্শনের গঠন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও বিবেচনায় নিয়ে করা হয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত এটি মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এই দর্শনটিকে তাদের চিন্তাধারার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তারা চায় যে, এখানে বসবাসকারী সবাই এটি মেনে নিক। ভারতীয় ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম ছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মে আগে থেকেই এই দর্শন বিদ্যমান ছিল। শিখ ধর্মে এই দর্শন ছিল না, তবে গত এক শতাব্দীতে তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে যারা এই দর্শনের প্রতি সমর্থন পোষণ করে। একইভাবে, হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ থেকে 'ওয়াহদাতুল উজুদ' এর এমন সংজ্ঞা ও দর্শন মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, যা অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

হিন্দুত্ববাদের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ গোলওয়ালকর এক মুসলিম সাংবাদিক জিলানিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে অদ্বৈতের তত্ত্ব সম্পর্কে বলেন:

> "এটিকে আপনি অদ্বৈত বলুন বা অন্য কিছু বলুন, কিন্তু এই দর্শন হিন্দুদেরও না, মুসলিমদেরও না। (অর্থাৎ এটি সবার)। এর সারসংক্ষেপ হলো যে, অস্তিত্ব একটাই। সেটাই একমাত্র সত্যি। সেটাই প্রকৃত আনন্দ। সেটাই স্রষ্টা, রব, এবং সেটাই ধ্বংস এবং সমাপ্তি করার ক্ষমতা রাখে। আমাদের মধ্যে আল্লাহর যত ধরনের ধারণা রয়েছে, তা সবই সেই চূড়ান্ত সত্যের সীমিত ধারণা। সেই চূড়ান্ত সত্য আমাদের সবাইকে সংযুক্ত করে। এই সত্য কোনো নির্দিষ্ট ধর্মে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত অভ্যাসের একটি পদ্ধতি।"[৬৫]

---

[৬৫] শ্রী গুরুজি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান মুসলিমস (Sri Guru ji and Indian Muslims) - রাকেশ সিনা (২০২০) পৃষ্ঠা: ১১, উদ্ধৃতির উর্দু অনুবাদ- হিন্দুত্বা কি ফিকরি আসাসিয়ত, (ہندتوا کی فکری اساسیت) - সাইয়্যেদ সা'দাতুল্লাহ হুসাইনি, মাহনামা জিন্দগি নও, শুমারা জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা: ১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সর্বধর্ম সমভাব (Sarva Dharma Sama Bhava)

আধুনিক বেদান্ত দর্শনের মতে, ধর্ম মানুষের অভিজ্ঞতার নাম। মানুষের কর্তব্য হল সত্যকে অনুসন্ধান করা। এই অনুসন্ধানে, যে অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্য দিয়ে সে যায় এবং যেসব বাস্তবতা ও নীতিমালা তার সামনে উন্মোচিত হয়, সেগুলিই ধর্মের প্রকৃত সত্য। এই উন্মোচন প্রতিটি মানুষের উপর হতে পারে।[৬৬]

যেহেতু প্রতিটি মানুষের উপর উন্মোচন সম্ভব, তাই ধারণা করা যায় যে, তত্ত্বগতভাবে একাধিক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সম্ভব। তাই, বেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে, বিভিন্ন ধর্ম একযোগে সঠিক হতে পারে। এই ধারণাটিকে "সর্বধর্ম সমভাব" বলা হয়।

"সর্বধর্ম সমভাব" শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল সকল বিশ্বাসের ধারা এক হতে পারে। তবে পরিভাষাগতভাবে এর মানে হল যে সমস্ত ধর্মই সত্য, অথবা (ধর্মের দৃষ্টিতে) সমস্ত পথ একই গন্তব্যে পৌঁছায়। মূলত এই ধারণাটি প্রচার করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার গুরু রামকৃষ্ণ। এবং "সর্বধর্ম সমভাব" এই ধারণাটি প্রাচীন বেদে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে ঋগ্বেদে[৬৭] একটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়, যা বলে যে সত্য এক হলেও তা ধর্মীয় নেতারা বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করেন। ঋগ্বেদে এর উদাহরণ হিসেবে অন্ধ মানুষদের এবং এক হাতির কাহিনী[৬৮] উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদাহরণে কিছু অন্ধ মানুষ জঙ্গলে গিয়ে একটি হাতির সঙ্গে সংঘর্ষ করেন। তারা আগে কখনও হাতি সম্পর্কে জানতেন না। সবাই তার ভিন্ন ভিন্ন অংশে হাত দিয়ে অনুভব করতে শুরু করল। প্রথম ব্যক্তির হাত তার শুঁড়ে লাগলে তিনি বললেন, এটা এক ধরণের মোটা সাপের মতো। দ্বিতীয় ব্যক্তির হাত তার কানেও পড়লে তিনি বললেন, এটি তো পাখার মতো। তৃতীয় ব্যক্তির হাত তার পায়ে পড়লে তিনি বললেন, এটা তো একটি স্তম্ভের মতো, যেন কোনো গাছের কাণ্ড। চতুর্থ ব্যক্তির হাত তার পাশের অংশে পড়লে তিনি বললেন, এটা তো এক ধরনের দেয়াল। একজনের হাত তার লেজে পড়লে তিনি

---

[৬৬] কন্টেম্পোরারি হিন্দুইজম: রিচুয়াল, কালচার, অ্যান্ড প্র্যাকটিস (Contemporary Hinduism: ritual, culture, and practice) -রবিন রাইনহার্ট (২০০৪)।

[৬৭] ঋগ্বেদ হিন্দুধর্মের চারটি পবিত্র গ্রন্থের (বেদ) একটি। অন্যান্য তিনটি হল যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। 'ঋগ্বেদ' এর একুশটি শাখা ছিল, যার মধ্যে একমাত্র একটি আজও বিদ্যমান, বাকি শাখাগুলো এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

[৬৮] 'ঋগ্বেদের' এই উদাহরণটি পঞ্চম শতাব্দী খ্রিষ্টপূর্বে জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়, এবং বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে এটি পুরো পৃথিবীজুড়ে পরিচিত হয়, এছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এই উদাহরণটি জনপ্রিয়।

বললেন, এটা এক রশির মতো। আরেকজনের হাত তার দাঁতে পড়লে তিনি বললেন, এটা তো এক কঠিন এবং মসৃণ জিনিস, যেন কিছু কঠিন বস্তু। শেষ পর্যন্ত তারা সবাই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে তারা আলাদা আলাদা জীবের সাথে সংঘর্ষ করেছে।"[৬৯]

এই তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্য অন্ধ মানুষ ও হাতির উদাহরণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সর্বধর্ম সমভাব এর পরিভাষাটি পরবর্তীতে গান্ধী গ্রহণ করেন এবং এটি তার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এরপর থেকে সর্বধর্ম সমভাব এর পরিভাষা এবং ধারণাটি ভারতের সেক্যুলার তত্ত্বে মূল ভূমিকা লাভ করে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এই তত্ত্বটি গ্রহণ করে এবং প্রয়োগ করে, কিন্তু যেহেতু এই পরিভাষাটি গান্ধীর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে এবং সেক্যুলার তত্ত্ব এটি গ্রহণ করেছে, তাই হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এই পরিভাষাটি ব্যবহার করে না। তবে তারা এই তত্ত্বটি নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।

এই ধারণার কারণে স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিমে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দ আমেরিকায় বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের সভায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি হিন্দু ধর্ম এবং অদ্বৈত বেদান্তের দর্শনকে পরিচিত করেছিলেন। এই পরিচয়ের সূচনা বিবেকানন্দ করেছিলেন "সর্বধর্ম সমভাব" ধারণা থেকে। বিবেকানন্দ সভা থেকে ভাষণ শুরুর আগেই বলেছিলেন, "আমেরিকান বোনেরা ও ভাইয়েরা"। এই বাক্যটি সেখানে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের এতই পছন্দ হয়েছিল যে, সম্মেলনে উপস্থিত সাত হাজার ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গিয়ে ২ মিনিট পর্যন্ত লাগাতার তালি বাজিয়েছিলেন। নিঃশব্দ হওয়ার পর তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করে বলেছিলেন:

> "আমি পৃথিবীর সবচেয়ে তরুণ এবং ছোট জাতির পক্ষ থেকে, পৃথিবীর প্রাচীনতম যোগী সিস্টেম, প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বৈদিক সিস্টেম এবং এমন একটি ধর্মের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি যা পৃথিবীকে সহিষ্ণুতা এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণের পাঠ দিয়েছে।"[৭০]

তারপর তিনি তার কিছু পছন্দের বই থেকে দুটি উদ্ধৃতি টেনে এনেছেন, যা সর্বধর্ম সমভাব- এর দর্শনের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

---

[৬৯] এনসাইক্লোপিডিয়া অফ পারসেপশন, (Encyclopedia of Perception), - ই. ব্রুস গোল্ডস্টাইন (২০১০) পৃষ্ঠা: ৪৯২

[৭০] এ কমপ্রিহেনসিভ বায়োগ্রাফি অফ স্বামী বিবেকানন্দ (A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda), - শৈলেন্দ্র নাথ ধর, খণ্ড- ১ পৃষ্ঠা: ৪৬১

"যেভাবে বিভিন্ন নদী বিভিন্ন জায়গা থেকে শুরু হয়, কিন্তু সব স্রোতই সমুদ্রে মিশে যায়, তেমনি, হে খোদা, যে বিভিন্ন পথ মানুষ অনুসরণ করে, যদিও সেগুলো একে অপর থেকে পৃথক, বাঁকা বা সোজা হতে পারে, সবই তোমার দিকে চলে আসে।"

"যে কেউ আমার দিকে চলে আসে, যতই যেভাবে চলে আসুক, আমি তার দিকে চলে আসি। সব মানুষ সে পথে চেষ্টা করছে, যেগুলো শেষ পর্যন্ত আমার দিকে এসে পৌঁছায়।"[৭১]

বিবেকানন্দ এই ভাষণের কারণে আমেরিকায় অনেক প্রশংসা লাভ করেন এবং তাকে একটি নায়কের মর্যাদা প্রদান করা হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়গুলো এই ভাষণের কারণে বিবেকানন্দের প্রশংসা করা শুরু করে। আমেরিকান পত্রিকা 'দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' (The New York Herald) এই বিষয়ে লিখেছে:

"স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্মের সংসদে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাকে শোনার পর আমরা অনুভব করলাম যে, এমন একটি বিদ্বান জাতির কাছে মিশনারীদের পাঠানো কতটা বোকামি ছিল।"[৭২]

স্বামী বিবেকানন্দ সার্বজনীন ধর্মসম্ভাবনার ধারণাকে অদ্বৈত Vedanta-এর অবধারিত ফলস্বরূপ মনে করতেন এবং এই ধারণার কারণে তিনি হিন্দুধর্মকে একমাত্র ধর্ম মনে করতেন যা সহিষ্ণুতা প্রচার করে। তিনি লিখেছিলেন:

"বিশ্বের সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে কেবল ভারতই সহিষ্ণুতা এবং আধ্যাত্মিকতার ভূমি হতে পারে। প্রাচীন যুগে তীব্রভাবে উঠে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যা আছে তা কেবল একটাই। ধর্মীয় নেতারা তাকে বিভিন্ন নাম দিয়ে ডাকতেন। এটি ছিল এখন পর্যন্ত মানবের মুখ থেকে বেরোনো সবচেয়ে স্মরণীয় উক্তি, যা এখন পর্যন্ত সন্ধান করা সবচেয়ে মহান সত্য। এই সত্যই আমাদের জাতিগত অস্তিত্বের মেরুদণ্ড। এর ফলে, এই পৃথিবী সহিষ্ণুতার ভূমি হয়ে উঠেছে।"[৭৩]

---

[৭১] এ কমপ্রিহেনসিভ বায়োগ্রাফি অফ স্বামী বিবেকানন্দ- (A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda), - শৈলেন্দ্র নাথ ধর, খণ্ড- ১ পৃষ্ঠা: ৪৬১

[৭২] মডার্ন রিলিজিয়াস মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া (Modem Religious Movements in India) - জে. এন. ফারকুহার (১৯১৫), পৃষ্ঠা: ২০২,

[৭৩] কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ (Complete Works of Swami Vivekananda) ভলিউম ৫, পৃষ্ঠা: ৯৮, হিন্দুত্বা আওর সেকুলার মুত্তাফাক্কিরিন, (هاندتو اور سيكولر مفكرين) -সৈয়দ সা'দাতুল্লাহ হুসাইনি, মাহনামা জিন্দেগী নাও, সংখ্যা- আগস্ট ২০২১, পৃষ্ঠা: ৮

হওয়া উচিত ছিল যে, স্বাতন্ত্র্য এবং সার্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা মতাদর্শের কারণে হিন্দুদের মধ্যে প্রকৃত সহিষ্ণুতা সৃষ্টি হতো এবং তারা ভারতের সকল ধর্মাবলম্বীকে তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে আপত্তি করতো না। কিন্তু বিষয়টি এর বিপরীতে হয়ে গেল। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এই মতাদর্শগুলিকে একমাত্র সঠিক হিসেবে ধারণ করলেন এবং যারা এসব ধারণায় বিশ্বাস রাখে না, তাদের শত্রু এবং সহিষ্ণুতা ছড়ানোর জন্য দায়ী হিসেবে আখ্যা দিলেন। এভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা সেমেটিক ধর্মগুলির বিরুদ্ধে এই মতাদর্শটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন যে, এই ধর্মগুলো শুধু নিজেদেরকেই সঠিক মনে করে, তাই তারা এই অঞ্চলে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করতে পারেনি এবং তাদের এখানে বসবাসের কোনো অধিকার নেই। এই প্রসঙ্গে গোলওয়ালকর লিখেছেন:

"এই সকল সেমেটিক ধর্ম—ইহুদী ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইসলাম—এগুলির জন্য একই ধরনের উপাসনার পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে। এই ধর্মগুলির মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিধি, একটি গ্রন্থ এবং একটি ঈশ্বর আছে, যার বাইরে মানব আত্মার মুক্তির আর কোনো পথ নেই। এমন দাবি করার জন্য অত্যাধিক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকভাবে, এই সেমেটিক ধর্মীয় ধারণার কারণে সহিষ্ণুতা উৎপন্ন হয়নি এবং মানুষ ধর্মের নামে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।"[৭৪]

হিন্দুত্ববাদের আরেক চিন্তাবিদ মনমোহন বেদি আরএসএস-এর পত্রিকা 'অর্গানাইজার' -এ লিখেছেন:

"প্রথাগতভাবে সেমেটিক চিন্তাধারা মানবজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখে। এক পক্ষ তারা যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস গ্রহণ করে, এবং অন্য পক্ষ তারা যারা তা গ্রহণ করে না। যারা গ্রহণ করে না, তাদের সম্পর্কে মনে করা হয় যে তারা শয়তানের বন্ধু এবং কাফের, এবং তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকারও নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই চিন্তাধারা কমিউনিজমের মতো (পশ্চিমা) মতাদর্শগুলোর ওপরও প্রভাব ফেলেছে, যেগুলি (সেমেটিক) অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে। এবং এই (মতাদর্শের অনুসারীরা) যারা তাদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্নমত পোষণ করে, তাদেরকেও অগ্রহণযোগ্য মনে

---

[৭৪] বাঞ্চ অফ থটস (Bunch of Thoughts), - এম. এস. গোলওয়ালকার, পৃষ্ঠা: ৯৫

ফগতে শুরু করেছে। অর্থাৎ, আপনি যদি কমিউনিস্ট না হন, তবে আপনি ডানপন্থী, যা একটি লজ্জাজনক বিষয়।"[৭৫]

হিন্দুত্ববাদের জীবনদর্শনের বর্ণনায় এই ধারণার কেন্দ্রীয় গুরুত্ব রয়েছে। তাদের মতে, এটি একটি বড় অপরাধ যে, মানুষ অন্যের ধর্মকে ভুল মনে করে এবং ধর্মকে কোনো একটি প্রামাণিক গ্রন্থ বা ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করে ফেলে। তারা এটিকে ভারতীয় দর্শনের বিপরীতে মনে করে এবং সেমেটিক, পশ্চিমা অথবা এমন কোনো চিন্তাধারা মনে করে, যা এই দেশের জন্য একেবারে অজানা। তারা এই চিন্তাধারাকে অনেক সমস্যার মূল বলে মনে করে। ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তাদের বিরোধিতার কারণও এইভাবেই বোঝানো হয় যে, এই ধর্মগুলো নিজেদের ছাড়া আর কাউকে সঠিক মনে করে না। কাফের এবং বিপথগামী মনে করে। তাই তারা কখনো অন্যদের সম্মান এবং মর্যাদা দিতে পারে না।

তবে এভাবে অপমান ও বিরোধিতা, এমনকি শত্রুতা প্রকাশ করে, তারা এটি ভুলে যায় যে, এভাবে তারা নিজেদেরই, সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার থাকার মূল মতবাদটি অস্বীকার করছে। এবং এভাবে, যে অভিযোগ তারা সেমেটিক ধর্মসমূহের বিরুদ্ধে তোলে, ঠিক একই কাজ তারা নিজেরাও করছে। তারা 'অদ্বৈত' এবং 'সর্বধর্ম সমভাব' স্লোগান তো দেয়, কিন্তু নিজেরা তার উপর পালন না করে, বরং এর বিপরীতে, তারা শুধু তাকে অধিকারী মনে করে যে এই ধারণাগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং বাকিদের সবকিছুকে মন্দের মূল হিসেবে দেখে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারত মাতা (মাদার ভারত)

আমরা গোলওয়ালকর-এর চিন্তাধারা সম্পর্কে উল্লেখ করেছি যে, হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা হিন্দু জাতিকে একটি জীবিত ও পূজনীয় অস্তিত্ব হিসেবে চিত্রিত করে। এই ধারণাটি তারা অদ্বৈতের দর্শন থেকে আহরণ করেছে। কিন্তু অদ্বৈতের দর্শনের মতে, আত্মা আল্লাহর অস্তিত্বের একটি অংশ, এবং তার নিজস্ব আলাদা অস্তিত্ব নেই।

[৭৫] রাষ্ট্র অ্যান্ড নেশন: এটার্নাল হিন্দু রাষ্ট্র (Rashtra and Nation: Eternal Hindu Rashtra) - ম্যানমোহন বৈদ্য, অর্গানাইজার, ইস্যু- ১৪ এপ্রিল ২০১৮ ইংরেজি, হিন্দুত্বা কী ফিকরি আসাসিয়াত (ہندتوا کی فکری اساسیات), সাইয়েদ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি রচিত, মাসিক জিন্দেগি নও, সংখ্যা- জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা: ১৮

এভাবে, সব মানুষই পবিত্র হয়ে ওঠে। এই সমস্যার সমাধানে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা একটি বুদ্ধিমান যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, মানুষ বলতে তারা হিন্দু জাতিকে বুঝায়, সমস্ত মানবতা নয়। অর্থাৎ, এটি 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (অস্তিত্বের ঐক্য) নয়, বরং "ওয়াহদাতুল হুনুদ (হিন্দুত্ববাদের ঐক্য) এর ধারণা। এই প্রসঙ্গে, আমরা গোলওয়ালকর-এর চিন্তাধারা উল্লেখ করেছি, যা এখানে আবার উদ্ধৃত করা হচ্ছে। গোলওয়ালকর এক জীবিত ও গতিশীল ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করে লিখেছেন:

এই বক্তব্য যে,খোদা নিরাকার (বিনা রূপে) এবং নির্গুন (বিনা গুণে) এবং এই ধরনের সমস্ত ধারণা আমাদের কোথাও নিয়ে যায় না। পূজার অনেক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। মানুষ মন্দিরে যায় এবং তাদের মনকে ঐসব স্থানে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করে, এই ভেবে যে এগুলি ঈশ্বরের চিহ্ন। কিন্তু এগুলি আমাদের মতো সচল মানুষের জন্য সন্তোষজনক নয়। আমাদের প্রয়োজন এক জীবন্ত ঈশ্বর। এমন ঈশ্বরের কি কাজ, যে শুধু শুনতে পারে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া দিতে সক্ষম নয়? এই চিহ্নগুলি না তো কাঁদে, না হাসে, এবং না কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়, অবশ্যই যারা সর্বোচ্চ স্তরের সন্ন্যাসী তারা ছাড়া। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য, এগুলি ঈশ্বরের এমন চিহ্ন, যারা কিছুই অনুভব করতে পারে না। তাই আমাদের প্রয়োজন এক জীবন্ত ঈশ্বর, যিনি আমাদের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টি করবেন এবং আমাদের মধ্যে লুকানো শক্তিগুলোকে উদ্ভাসিত করবেন।[৭৬]

পরবর্তী অনুচ্ছেদে গোলওয়ালকর প্রমাণ করেন যে, এই জীবন্ত ঈশ্বর আসলে জাতির জনগণ। তিনি লিখেছেন:

> "আমাদের পূর্বপুরুষরা বলতেন, আমাদের মানুষই আমাদের ঈশ্বর। শ্রী রামকৃষ্ণ, যিনি মানবতার অন্যতম মহান শিক্ষক, বলেছিলেন, 'মানুষের সেবা করো।' তার মহান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু যখন মানুষকে সমগ্র মানবতার দৃষ্টিকোণে দেখা হবে, তখন এটি একটি অত্যন্ত বিস্তৃত ধারণা, এবং তাই এটি সহজে একক রূপে দেখা এবং অনুভব করা খুবই কঠিন। সেজন্য অনেক লোক যারা মানবতার সেবা করার চিন্তা নিয়ে উঠেছিলেন, তারা কিছুই করতে পারেননি। তাই আমাদের পূর্বপুরুষরা, মানব মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা মেনে বলেছিলেন, 'মানবতা এবং এগুলি সব ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে যে কেউ এই স্তরে পৌঁছাবে, তাকে

[৭৬] বাঞ্চ অফ থটস (Bunch of Thoughts) - এম. এস. গোলওয়ালকর, পৃষ্ঠা: ৪৬

ঈশ্বরের ধারণা কিছু সীমাবদ্ধতা ও শর্ত সহকারে রাখতে হবে, যা কেউ বুঝতে পারবে, অনুভব করতে পারবে এবং তার সেবা করতে পারবে।' তারা বলেছিলেন যে হিন্দু জাতি হল 'বীর পুরুষ' (অর্থাৎ ঈশ্বরের তাজাল্লি)। যদিও তারা 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করেননি, তবে এটি ঈশ্বরের সংজ্ঞার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়, যেখানে বলা হয়েছে, 'সূর্য ও চন্দ্র তার চোখ, তারা ও আকাশ তার নাভি থেকে সৃষ্টি, ব্রাহ্মণ তার মাথা, ক্ষত্রিয় তার হাত, বৈশ্য তার উদর এবং শূদ্র তার পা।' এর মানে হল যে যারা এই চার স্তরের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন, অর্থাৎ হিন্দু জাতি, তারা আমাদের ঈশ্বর।"[৭৭]

কিন্তু যদি পুরো হিন্দু জাতি একটি ঈশ্বরের সমতুল্য এবং পূজনীয় জীবন্ত সত্তা হয়, তবে এটা কি কোনো একক অস্তিত্বের নাম নয়? এটি তো কোটি কোটি মানুষের সমষ্টি, তাহলে এই জাতির উপাসনা কিভাবে হবে? কোন একজন হিন্দু কি নিজেই নিজের উপাসনা শুরু করবে? অথবা যে প্রথম হিন্দু তার সামনে দেখা দেবে, তার সামনে সিজদা দিবে এবং তার কাছে নিজের কামনা কামনা করবে? হিন্দু জাতিকে ঈশ্বর বলা এবং তাকে পূজনীয় বলা একটি হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি করে। এই সমস্যার সমাধান করতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা একটি প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন, যে হিন্দু জাতির ঈশ্বরত্বের প্রকাশ ভারত মাতায় হয়, যা শুধুমাত্র একটি মূর্তি নয়, বরং একটি জীবন্ত ঈশ্বর। এটি ঈশ্বরের চিহ্ন এবং হিন্দু জাতিরও চিহ্ন, কারণ উভয়ই একে অপরের অংশ, অর্থাৎ এক অস্তিত্বের অংশ। সেজন্য এটি পবিত্র।

গোলওয়ালকর ভারত মাতা এর সীমানার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন:

> "হিমালয়ের সাথে আমাদের মাতৃভূমি তার দুটি বাহু দুটি সাগরের মধ্যে প্রসারিত করেছে, আরিয়ান (ইরান) এর পশ্চিমে এবং শ্রিঙ্গাপুর (সিঙ্গাপুর) তার পূর্বে, অপরদিকে শ্রীলঙ্কা (সিলোন) দক্ষিণ সাগরের দিকে একটি পদ্মফুলের মতো, যা মাতা-এর পদতলে নিবেদন করা হয়েছে। এটি সেই ছবি যা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মননে উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করেছে।"[৭৮]

[৭৭] বাঞ্চ অফ থটস (Bunch of Thoughts) - এম. এস. গোলওয়ালকর, পৃষ্ঠা: ৪৬, ৪৭

[৭৮] বাঞ্চ অফ থটস (Bunch of Thoughts) - এম. এস. গোলওয়ালকর, পৃষ্ঠা: ৮১

'ভারত' শব্দের উৎস

ভারত মাতা ধারণার বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার আগে এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারত ভূখণ্ডের জন্য "ভারত" শব্দটি কোথা থেকে এসেছে। হিন্দু ধর্মের অন্যান্য শব্দগুলোর মতো, এই শব্দের উৎস নিয়েও বিভিন্ন মতামত রয়েছে-

এক. একটি মতামত হল যে, "ভারত" শব্দটি "ভরত" থেকে এসেছে, যা আর্যাবর্তের[৭৯] প্রধান গোত্র ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, এই গোত্রটি দ্বিতীয় হাজার অব্দে দক্ষিণ আফগানিস্তানে সরস্বতী নদীর তীরে বাস করত। এই গোত্রের রাজা ছিলেন দেবদাস। দেবদাসের পুত্র সুদাস এবং আরেকটি বড় গোত্র পোরো -এর নেতৃত্বে অন্যান্য সব গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী একটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, যাকে "দশ রাজার যুদ্ধ" বলা হয়। এই যুদ্ধে ভরত গোত্র বিজয়ী হয়। এরপর ভরত এবং পোরো গোত্রের বংশধররা উত্তর ভারত (হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের কিছু অঞ্চল) অঞ্চলে কুরু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল ১২০০ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কাল এবং এই সাম্রাজ্য ভারতের ইতিহাসে প্রথম ঐক্য সরকার ছিল। এবং যেহেতু এই সাম্রাজ্য মূলত ভরত গোত্রের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই আজকের হিন্দুরা ভারতকে এই "ভরত" গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত করে।

দুই. আরেকটি মতামত হলো যে, ভারত নামটি হিন্দুদের পবিত্র মহাকাব্য মহাভারতে উল্লেখিত রাজা ভারত থেকে এসেছে। এই রাজা ভারত মহাভারতে উল্লেখিত সমস্ত গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিলেন, যার মধ্যে দুইটি প্রধান গোত্র কুরু ও পাণ্ডু, যাদের মধ্যে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে লড়াই হয়েছিল। এছাড়া আরও দুটি গোত্র, ব্রাহ্মধৃত এবং জরসিন্ধুরও পূর্বপুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্ক ছিল ভরত গোত্রের সাথে এবং তাঁর সন্তানরা যেসব গোত্রে বিভক্ত হয়েছে, যেগুলোর নাম মহাভারতে উল্লেখ আছে, সেগুলি কুরু রাজ্য থেকেই এসেছে। আর সেই মহাভারতের গোত্রের পূর্বপুরুষ ভারত নামের উপরেই আজকের ভারত নামক দেশটির নামকরণ হয়েছে। এজন্য হিন্দুরা একে ভারতবর্ষ বলে, অর্থাৎ ভারত রাজার ভূমি। তবে যদি এই গোত্রগুলোর ইতিহাস মহাভারতের বাইরে খুঁজে দেখা হয়, তাহলে তাদের পুরো বংশে কোথাও ভারত নামের

[৭৯] "আর্যাবর্ত" মানে হলো আর্যদের ভূমি। খ্রিষ্টপূর্ব যুগে আর্যরা অভিবাসন করে ভারতের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং উত্তর ভারতের অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন, এই আক্রমণকে ঐতিহাসিকভাবে "আর্যাবর্ত" বলা হতে শুরু করে।

মধ্য এশিয়ায় এর সমশব্দ "আরিয়ানা" পাওয়া যায়, যা আফগানিস্তানের জন্যও ব্যবহৃত হয়। এর মানে হলো আর্যদের ভূমি। এই নামটি দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, হিজরতের আগে আরিয়ানা অর্থাৎ আর্য জাতিসমূহ মধ্য এশিয়ায় বসবাস করত।

রাজা উল্লেখিত হয়নি। মহাভারতেও স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, এই গোত্রগুলো কোথাও গিয়ে ভারত রাজার সাথে যুক্ত হয়েছে। মহাভারতের আটটি গ্রন্থের প্রথম গ্রন্থ এবং অন্যান্য পুরাণে উল্লেখ আছে যে, এই রাজা 'ভারত' এর বাবার নাম ছিল 'দেশনাত'। এবং রাজা ছিলেন একজন চক্রবর্তী রাজা। মহাভারতে উল্লেখিত সমস্ত গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিলেন, তবে মহাভারতে পরবর্তীকালে এই গোত্রগুলোর পূর্বপুরুষকে কুরু রাজা বলা হয়েছে এবং তার পুরো বংশের বিস্তারিত বিবরণও দেয়া হয়েছে, কিন্তু এই বংশের মধ্যে কোথাও ভারত রাজার নাম আসেনি।

তিন. আরেকটি মত অনুযায়ী, 'ভারত' শব্দটি এক দানবিক কিংবদন্তির রাজা ভারত নামে এক রাজা থেকে এসেছে, যার পিতার নাম ছিল রেশাবনাথ। যেভাবে দশরথের পুত্র ভারত সম্পর্কে কিছু পুরাণে উল্লেখ রয়েছে, তেমনি অন্যান্য পুরাণে 'রেশাবনাথ' নামে এক পিতার পুত্র ভারত সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাকে 'চক্রবর্তী' বলা হয়। তবে এই প্রথম উল্লিখিত ভারত থেকে বেশি পৌরাণিক, কারণ বলা হয় যে, তিনি পুরো পৃথিবী জয় করেছিল এবং পৃথিবীজুড়ে শাসন করেছিল। আর এই মত অনুসারে, তার নামের কারণে ভারতবর্ষকে 'ভারতবর্ষ' বলা হয়।

প্রথমে উল্লেখিত ভারত বাদশাহের মতটি বর্তমান হিন্দুরা গ্রহণ করেছে, যেখানে পরবর্তীতে উল্লেখিত ভারত বাদশাহর সাথে সম্পর্কিত মতটি বর্তমান জৈন ধর্মাবলম্বীরা গ্রহণ করেছে। তবে খ্রিস্টপূর্বকালে ভরত গোত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো বিতর্ক ছিল না।

চার. আরেকটি মতামত আছে যে, ভারত "অগ্নিদেবী" (আগুনের দেবী) এর একটি উপাধি। এবং অগ্নিদেবীর সম্পর্কেই ভারতের নাম 'ভারত' রাখা হয়েছে।

যাই হোক, এসব মতামতের মধ্যে যেটি সঠিক হোক না কেন, একটি বিষয় পরিষ্কার যে, 'ভারত' নামটি হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং এর বাইরে অন্য কিছু সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। ভারতের সংবিধানে ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রের আরেক নাম হিসেবে 'ভারত' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, "ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত" (ইন্ডিয়া হচ্ছে ভারত)। এই বাক্য থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়-

এক. সরকারি পর্যায়ে 'ইন্ডিয়া' নামটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, এবং

দুই. যদিও সরকারিভাবে এটিকে 'ইন্ডিয়া' বলা হবে, আসলে এটি 'ভারত'।

বছর বছর আজ সংঘ পরিবার সরকার ভারত শব্দটিকে দেশের নাম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার এবং স্থায়ীভাবে শুধুমাত্র "হিন্দুস্থান" প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। 'ভারত' শব্দটি এখন ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে এমনিতেই প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আজ

ভারতবর্ষের মুসলিমদের মধ্যেও এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা 'হিন্দুস্থান' শব্দটি ব্যবহার করেন। এটি সংঘ পরিবারের একটি প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে তারা দেশের মধ্যে থেকে ব্রিটিশ শাসন এবং মুসলিম শাসনের সমস্ত চিহ্ন ও প্রভাব মুছে ফেলছে, এবং সব দিক থেকে ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

'ভারত মাতা' ধারণার সৃষ্টি

ভারত মাতার ধারণা মূলত ধর্মীয়ের চেয়ে বেশি একটি রাজনৈতিক ধারণা। এবং হিন্দুত্ববাদ এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অধিকাংশ রাজনৈতিক চিন্তাধারার মতো, এটাও খুব পুরনো নয়, এবং মূলত এটি ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত।

'ভারত মাতা'র ধারণা প্রথমবার ১৮৭৩ সালে কীরণচন্দ্র ব্যানারজি তার একটি স্টেজ নাটক 'ভারত মাতা'-এ উপস্থাপন করেন, যেখানে তিনি ভারত মাতাকে একটি দেবী হিসেবে চিত্রিত করেন, যিনি মানুষকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করতেন। এই নাটকের পর ভারত মাতার এই ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে বহু দশক ধরে এটি ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে জড়িত থাকে।

ভারত মাতার ধারণাকে প্রথম ধর্মীয় রঙ ১৯৩০ সালে দেওয়া হয়। তখন হিন্দু দেবী দুর্গার রূপে একটি দেবী তৈরি করা হয়, এবং তাকে ভারত মাতার দেবী হিসেবে অভিহিত করা হয়, এবং বলা হয় যে, ভারতীয় সভ্যতার সমস্ত দেবী একত্রিত হয়ে এই এক দেবী রূপে মিলিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান দেবী দুর্গা।

১৯৩৪ সালে ভারত মাতা একটি মন্দির বানানো হয় বেনারসে, যার উদ্বোধন করেছিলেন গান্ধী। তবে এই মন্দিরে কোন মূর্তি রাখা হয়নি, বরং শুধুমাত্র সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি ভারতের একটি মানচিত্র ছিল। পরে এই মানচিত্রের সঙ্গে ভারত মাতার একটি মার্বেল মূর্তি স্থাপন করা হয়।

১৯৮৩ সালে সংঘ পরিবারের সাথে যুক্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হরিদুয়ারে ভারত মাতা নামে একটি মন্দির তৈরি করার কাজ শুরু করে। যার উদ্বোধন করেছিলেন সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। আট তলা বিশিষ্ট এই মন্দিরের প্রথম তলা ভারত মাতার মূর্তির জন্য নিবেদিত। দ্বিতীয় তলা (শোর মন্দির) স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা নেতাদের জন্য নির্ধারিত। তৃতীয় তলা (মাতৃ মন্দির) ভারত ইতিহাসের মহান নারীদের জন্য। চতুর্থ তলা সান্ত মন্দির, যেখানে জৈন, শিখ ও বৌদ্ধ

ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম তলায় শক্তি, দুর্গা, পার্বতী, সতি, রাধা, সরস্বতী এবং কালীর মূর্তি রয়েছে। সপ্তম তলায় বিষ্ণু দেবতার মূর্তি এবং অষ্টম তলায় শিব মন্দির রয়েছে। এই ধরনের মন্দির এখন অন্যান্য শহরেও নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি মন্দির ২০১৫ সালে কলকাতায় উদ্বোধন করা হয়, যেখানে ভারত মাতার প্রতীক হিসেবে দুর্গা দেবীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৯ সালে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্র এলাকার নিকটবর্তী জিওতিসরের অঞ্চলে পাঁচ একর জমি ভারত মাতার মন্দির নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করেছেন।

গোত্রপূজা এবং ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এই মিশ্রণের চিহ্নিত প্রকাশ হিন্দুত্ববাদের নির্দিষ্ট দর্শন 'ভারতীয় বা হিন্দুস্তানি হওয়া' এর প্রতিনিধিত্ব করে। এতে বিভিন্ন ভারতীয় ধর্ম এবং তাদের আচার-অনুষ্ঠানগুলো একটি সাধারণ ঐতিহ্য হিসেবে প্রদর্শিত হয় এবং এই সাধারণ ঐতিহ্যের ভারতীয় জাতির সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক প্রকাশ পায়। যদিও তথাকথিত সেমিটিক ধর্মাবলম্বী এবং তাদের ধর্মীয় ধারণা ও অনুভূতির এখানে কোনো স্থান থাকে না এবং তারা এই সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ও অপরিচিত মনে হয়।

"ভারত মাতার" এই স্লোগানটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতীক এবং এই স্লোগান দেওয়া প্রতিটি ভারতীয় সেনা সদস্যের জন্য ধর্ম নির্বিশেষে বাধ্যতামূলক। তদ্ব্যতীত, আরএসএসও তাদের শাখা সম্মেলনগুলোর শুরু একটি প্রার্থনা দিয়ে করে, যার প্রাথমিক শব্দগুলি হলো, "হে মাতৃভূমি, আমি চিরকাল তোর সামনে মাথা নত করি।"

ভারত মাতা ধারণাটি হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অস্ত্র, যার মাধ্যমে তারা ভারতের সকল নাগরিকদের কাছে দাবি জানায় যে, ভারতের ভূমি তাদের দৃষ্টিতে অন্যান্য সমস্ত পবিত্র বস্তু থেকে অধিক পবিত্র হওয়া উচিত।

আমরা হিন্দুত্ববাদের পরিচিতি দেওয়ার সময়ে উল্লেখ করেছি যে, সাভারকর একজন ব্যক্তির জন্য ভারতীয় জাতির অংশ হওয়ার শর্ত হিসাবে বলেছেন যে, তাকে এই ভূমিকে আদি ভূমি এবং পবিত্র ভূমি হিসেবে মেনে নিতে হবে। পবিত্র নদী এখানে থাকা নদীগুলোই হবে, পবিত্র স্থানগুলো এখানেই অবস্থিত হবে, এবং যেসব ব্যক্তিত্ব এবং ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর প্রতি গর্ব করা হয়, তাদের সম্পর্ক এই ভূমির সাথে থাকতে হবে। তেমনই, গোলওয়ালকরও মুসলমানদের সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন:

তাদের (মুসলমানদের) এই উপলব্ধি করতে হবে যে, একসময় তারা হিন্দু ছিলেন, এবং এটি তাদের কর্তব্য যে, তারা এই ভূমির প্রতি আনুগত্য রেখে, সততার সাথে এর

সেবা করবেন, তাদের সহ-দেশবাসীদের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করবেন এবং এই ভূমির রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সম্মান করবেন।[৮০]

অটল বিহারী বাজপেয়ীকে আন্দোলনকারী হিসেবে একটি মধ্যমপন্থী মুখ ও মস্তিষ্ক হিসেবে মনে করা হত। তবে এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি স্পষ্টতা পাওয়া যায় তার নিজস্ব লেখনী থেকে। তিনি লিখেছেন:

"এই দেশের মুসলমানদের সঙ্গে তিন ধরনের আচরণ করা যেতে পারে-

প্রথমটি হলো 'তিরস্কারের' আচরণ, অর্থাৎ, যদি তারা নিজেদের পরিবর্তন না করে, তবে তাদের একা ছেড়ে দাও, প্রত্যাখ্যান করো এবং তাদের শত্রু হিসেবে মনে করো।

দ্বিতীয়টি হলো 'পুরস্কারের' আচরণ, অর্থাৎ, তাদের প্রতি প্রশংসা বা মিথ্যা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, অর্থাৎ, তাদের ঠিক রাখতে ঘুষ দেওয়া, যেটি তখনকার কংগ্রেস করছিল।

তৃতীয়টি হলো 'পরিষ্কারের' আচরণ, অর্থাৎ, তাদের পরিবর্তন করতে বলা এবং তাদেরকে আদব শেখানো, যাতে তারা জাতীয় স্রোতধারায় শামিল হয়।

আমরা এটি করতে চাই না। তাদের ধর্ম পরিবর্তন হবে না। তারা তাদের ধর্ম অনুসরণ করতে পারে। মক্কা তাদের পবিত্র স্থান হতে পারে, তবে ভারত অবশ্যই সেই পবিত্র স্থান থেকেও পবিত্র হতে হবে। আপনি মসজিদ বানান, নামাজ পড়ুন, রোজা রাখুন, আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে যদি মক্কা এবং ভারত-এর মধ্যে নির্বাচন করার অবস্থা আসে, তবে আপনাকে সর্বদা ভারতকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। সমস্ত মুসলমানের মধ্যে এই অনুভূতি থাকা উচিত যে, আমরা ভারতের জন্য বাঁচব এবং ভারতের জন্য মরব।"[৮১]

[৮০] বাঞ্চ অফ থটস (Bunch of Thoughts) - এম. এস. গোলওয়ালকর, পৃষ্ঠা: ২৫৬

[৮১] দ্য সংঘ ইজ মাই সউল (The Sangh is my Soul) - অটল বিহারি বাজপেয়ী, "অর্গানাইজার" ম্যাগাজিন, ১৬ আগস্ট ২০২০, হিন্দুত্বা কী ফিকরি আসাসিয়ত (ہندتوا کی فکری اساسیت), সাইয়েদ সাআদাতুল্লাহ হুসেইনি, মাসিক জিন্দেগী নও, জুলাই- ২০২১, সংখ্যা: ১৫)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন্দে মাতরম (Vande Mataram)

ভারত মাতা সম্পর্কিত একটি বিষয় হলো ভারতের জাতীয় গানের 'বন্দে মাতরম'[৮২]। যেখানে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ভারত মাতার পবিত্রতাকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক মনে করেন এবং তারা দাবি করেন যে, এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিককেই ভারত মাতাকে পবিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে, তাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে যে, 'বন্দে মাতরম' গানটি গাওয়াকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করে তোলা হোক।

"বন্দে মাতরম" এর অর্থ হলো, "আমি তোর সামনে মাথা নত করি, ও মা।" এই কবিতাটি বাংলা ভাষায় ভারত মাতা'কে উদ্দেশ্য করে রচিত একটি গীতি, যা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৮২ সালে তাঁর উপন্যাস আনন্দমঠ তে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই উপন্যাসটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে লেখা এবং ভারত মাতা দেবীর উল্লেখও সেখানে ছিল। ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতাটি সঙ্গীতের আকারে রচনা করেন এবং কংগ্রেসের এক সম্মেলনে এটি গেয়ে শোনান, তারপর থেকে এটি ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত মিছিল এবং প্রতিবাদে বন্দে মাতরম হিন্দুদের এক ধরনের স্লোগান হয়ে ওঠে। কিন্তু মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়গুলি এই কবিতাটিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার বিরুদ্ধে কঠোর বিরোধিতা করে, কারণ এতে ভারত মাতা দেবীকে প্রার্থনা করা হয়েছে এবং তাছাড়া দুর্গা, শক্তি এবং হিন্দুদের অন্যান্য দেবী-দেবীর উল্লেখও রয়েছে।

কংগ্রেসে এই নতুন জাতীয় সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়। মুসলিমদের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতার কারণে কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে, যার মধ্যে ছিলেন মাওলানা আজাদ, জওহরলাল নেহরু, সুভাষ চন্দ্র বোস এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম দুটি স্তবক নির্বাচন করা হয়।

[৮২] কিছু ভারতীয় বিশেষত পূর্ব ভারতীয়রা এটি "বন্দে মাতরম" বলেও আখ্যায়িত করেন।

মাওলানা আজাদ এবং কিছু অন্যান্য মুসালমের পক্ষ থেকে এই গানের প্রথম দুই স্তবক গ্রহণ করার কারণ হলো "বন্দে" শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ। এই শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো সম্মান ও প্রশংসা বা সালাম প্রদান, কিন্তু এর আরেকটি অর্থও রয়েছে, তা হলো সিজদা করা বা পূজা করা। তাই যারা এই গানের প্রথম দুই স্তবক গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন, তাদের মত ছিল যে এতে ভারত মাতা'র সম্মান জানানো হয়েছে, তাকে সালাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে তার পূজা বা তার সামনে সিজদা করার কথা বলা হয়নি।

কিন্তু এই মতামতটি জনপ্রিয় হয়নি। খোদ হিন্দুরাও এর অর্থ ভারত মাতার সম্মানে মাথা নত করা হিসেবে গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ চন্দ্র বসুকে লিখিত এক চিঠিতে এই মতের বিরোধিতা করে লিখেছিলেন:

> "বন্দে মাতরম" যা দুর্গা দেবীর প্রশংসা, তা এই গানে এতটাই স্পষ্ট যে এ বিষয়ে কোন বিতর্ক হতে পারে না। কোন মুসলমানের কাছ থেকে এটি আশা করা উচিত নয় যে তিনি দেশপ্রেমের অনুভূতি থেকে এই দশ বাহুর দেবীকে জাতি বা মাতৃভূমি হিসেবে পূজা করবেন।[৮৩]

স্বাধীনতার পর "জন গণ মন" কে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এবং ১৯৫০ সালে "বন্দে মাতরম"-এর প্রথম দুটি স্তবককে জাতীয় সঙ্গীত থেকে আলাদা করে একটি জাতীয় গান হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতার পর থেকেই এটি হিন্দু-মুসলিম বিরোধের একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুরা যেখানে এই গানের মাধ্যমে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত করা প্রয়োজনীয় মনে করে, সেখানে মুসলিমদের মধ্যে অনেক আলেম এই গানটি শিরক হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন এবং এটি গাইতে নিষেধ করেছেন। ২০০৬ সালে কংগ্রেস সরকারের অধীনে, বিজেপি এবং অন্যান্য হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের চাপের ফলে, ১২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে, পুরো দেশে সব স্কুলে একটি নির্দিষ্ট সময় ও দিনে এই গানটি সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। এবং ২০০৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পুরো ভারতের স্কুলগুলোতে এই গানটি পরিবেশিত হয়।তবে মুসলিমদের মধ্যে এমন কিছু গোষ্ঠীও আছে, যারা এই গানের প্রথম দুটি স্তবক পাঠ করতে উপযুক্ত মনে করেন। রাজীব গান্ধী সরকারের সময় মন্ত্রী থাকা আরিফ মাহমুদ খান এই গানের উর্দু অনুবাদ করেছিলেন,

[৮৩] সিলেক্টেড লেটারস অফ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Selected Letters of Rabindranath Tagore) - কে. দত্ত এবং এ. রবিনসন, পত্র নম্বর: ৩১৪।

যার প্রথম দুটি স্তবক নিম্নরূপ:

تسلیمات، ماں تسلیمات تیری راتیں روشن چاند سے

تو بھری ہے میٹھے پانی سے تیری رونق سبز فام سے

پھل پھولوں کی شادابی سے تیری پیار بھری مسکان ہے

دکھن کی ٹھنڈی ہواؤں سے تیری میٹھی بہت زبان ہے

فصلوں کی شہانی فضاؤں سے تیری باہوں میں میری راحت ہے

تسلیمات، ماں تسلیمات تیرے قدموں میں میری جنت ہے

تسلیمات، ماں تسلیمات

"সালাম, মা, সালাম তোমার রাতগুলো চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল
তুমি ভরা মিষ্টি পানির স্রোতে তোমার সৌন্দর্য সবুজ প্রকৃতিতে বিকশিত
ফল-ফুলের সতেজতায় ভরে আছে তোমার ভালোবাসার হাসি
দক্ষিণ দিকের শীতল বাতাসে তোমার ভাষা মধুরতায় পরিপূর্ণ
ফসলের সুরভিত পরিবেশে তোমার কোলে আমার শান্তি খুঁজে পাই
সালাম, মা, সালাম তোমার পায়ের নিচেই আমার জান্নাত
সালাম, মা, সালাম!"

ভারতের পত্রিকা আউটলুক ইন্ডিয়া এই অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছে:

"এই অনুবাদ অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক।"[৮৪]

৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে, যখন সরকার স্কুলগুলোতে এক দিনের জন্য "বন্দে মাতরম" পড়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে, তার এক দিন আগে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে অল ইন্ডিয়া সুন্নি আলেম বোর্ড একটি ফতোয়া জারি করেছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে মুসলিমরা এই গানের প্রথম দুটি স্তবক পাঠ করতে পারেন। বোর্ডের সভাপতি মুফতি সাইয়েদ শাহ বদরুদ্দীন কাদেরি জিলানী যুক্তি দিয়েছিলেন যে:

[৮৪] www.outlookindia.com/websita/storyhamecessary-and-inolerant/২৩২৪২০

"যদি আপনি সম্মানের সাথে আপনার মায়ের পায়ের কাছে মাথা নত করেন, তবে এটি শিরক নয়, এটি কেবল সম্মান।"[৮৫]

তবে তারা এই যুক্তি পেশ করতে গিয়ে হয়তো ভুলে গেছেন যে, এখানে মা মূলত মা নয়, বরং একটি মাটির টুকরোকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে।

মোদি সরকারের ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংঘ পরিবারের সাথে সম্পর্কিত সংগঠনগুলো তাদের প্রচেষ্টা তীব্র করে দিয়েছে যে, স্কুলগুলোতে "বন্দে মাতরম" গাইতে বাধ্যতামূলক করা হোক। এই সংগঠনগুলোর লোকেরা কিছু সময় পর পর বিভিন্ন স্কুলে, বিশেষ করে মুসলিম স্কুলগুলোতে গিয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের "বন্দে মাতরম" গাইতে বাধ্য করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, যে জুলাই ২০১৭ সালে মাদ্রাজ হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে তামিলনাড়ুর সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সপ্তাহে অন্তত একবার "বন্দে মাতরম" গাওয়া উচিত। এর পাশাপাশি, সমস্ত সরকারি অফিস এবং কারখানায়ও অন্তত মাসে একবার এটি গাওয়া উচিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিন্দু রাষ্ট্র (Hindu Rashtara)

হিন্দু রাষ্ট্রের শব্দটি মূলত সংস্কৃতিবাদীদের পক্ষ থেকে অনেক ব্যবহৃত হয়। সংঘ পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তারা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করবে।

হিন্দু রাষ্ট্রের অর্থ হল এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে হিন্দুধর্ম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং যেখানে সরকার হিন্দু আইন ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি—প্রতিটি দিকেই হিন্দু মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য প্রাধান্য পায়। হিন্দু রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো হিন্দুদের দুই পবিত্র শাস্ত্রের ওপর-

[৮৫] নাও এ ফতোয়া টু সিং বন্দে মাতরম, (Now a Fatwa to sing Vande Mataram) মোহাম্মদ এ বাসিথ, (৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬), দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া

এক. মনুস্মৃতি

মনুস্মৃতি (Manusmriti) হিন্দুধর্মের অনেক ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে একটি। মনুস্মৃতি একটি তুলনামূলকভাবে আধুনিক নাম। প্রাচীন সংস্করণে এই গ্রন্থটির নাম ছিল মণু ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্র হল হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহার ও আইনসংক্রান্ত গ্রন্থ। হিন্দুধর্মে কতগুলো ধর্মশাস্ত্র আছে, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এগুলির সংখ্যা ১৮ থেকে ১০০-এর মধ্যে হতে পারে, এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আইন এবং নীতিমালায় পার্থক্য রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিভেদ রয়েছে, বরং প্রতিটি ধর্মশাস্ত্রেরও অনেকগুলো সংস্করণ রয়েছে এবং এই সংস্করণগুলির মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।

এই সমস্ত ধর্ম শাস্ত্র ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিলীন হয়ে গেছে এবং শুধু মনু ধর্মশাস্ত্র (মনুস্মৃতি) বেঁচে আছে। মনুস্মৃতির আজ প্রায় পাঁচিশটি সংস্করণ পাওয়া যায়। তবে যে সংস্করণের সবচেয়ে বেশি অনুবাদ হয়েছে এবং যেটি ১৮ শতক পর থেকে সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করা হয়, তা হল কলকাতার সংস্করণ।

মনুস্মৃতি হিন্দুধর্মে বর্ণ ব্যবস্থা (জাতি ব্যবস্থা) সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি-নিষেধ বর্ণিত একটি মৌলিক গ্রন্থ। এই বইটিতে বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে অধিকার ও কর্তব্য, আইন, আচরণ এবং নীতি ও অনীতির বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। মনুস্মৃতি-তে জাতি অনুযায়ী কাজ ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জাতির সদস্য শুধুমাত্র তার অবস্থান অনুযায়ী কাজ করতে পারবে, অন্য কোনো কাজ করার জন্য তাকে অনুমতি নেই। এই বিভাজন নিম্নরূপ:

ব্রাহ্মণ: পুরোহিত, পণ্ডিত, পুজারি, গুরু

ক্ষত্রিয়: রাজা, মন্ত্রী, প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যোদ্ধা

বৈশ্য: জমিদার, কৃষক, ব্যবসায়ী

শূদ্র: কারিগর, শ্রমিক, দাস

এই বিভাজন অনুসারে, প্রতিটি জাতি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারিত ছিল, এবং অন্য জাতির কাজ করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

দুই. অর্থশাস্ত্র (Arthashastra)

অর্থশাস্ত্র হলো সংস্কৃত ভাষায় রাজ্য পরিচালনা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামরিক কৌশল সম্পর্কিত বিষয়ের উপর লেখা চুক্তিপত্রের একটি সংগ্রহ। এর রচয়িতা হিসেবে

'কৌটিল্য' বা 'চাণক্য' কে গণ্য করা হয়, যিনি মৌর্য রাজবংশের[৮৬] প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরামর্শক ছিলেন। অধিকাংশ গবেষকদের মতে, এই সমস্ত চুক্তিপত্র একক রচয়িতার রচনা নয়; বরং শতাব্দী পেরিয়ে বিভিন্ন লেখক এতে সংযোজন করেছেন। দ্বিতীয় শতাব্দী খ্রিস্টপূর্ব থেকে তৃতীয় শতাব্দী খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর রচনা ও সম্পাদনা হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে এতে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দী খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর বিষয়বস্তু শাসনকার্য ও সরকারের কাজে প্রভাব ফেলতে থাকে, তারপর এটি হারিয়ে যায়। পরে ১৯০৫ সালে সংস্কৃতের বিশেষজ্ঞ রুদ্রপত্ন শমশাস্ত্রী (R Shamasastry) একে পুনরায় আবিষ্কার করেন এবং ১৯০৯ সালে এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

যদিও অর্থশাস্ত্রের বিষয় গুলো খুবই বিস্তৃত। এতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার গুরুত্ব, অর্থনৈতিক কৌশল তৈরি করার গুরুত্ব, রাজা কর্তৃক অধিকার ও কর্তব্য, সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মান, মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব এবং তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক আইন এবং কর আদায়ের মতো বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, তবে যেসব বিষয় ভারতের বাইরের বিশ্বের কাছে এই গ্রন্থটিকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এনে দিয়েছে, তা হলো যুদ্ধ ও শান্তি, গুপ্তচরবৃত্তি এবং পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো।

অর্থশাস্ত্রে যুদ্ধ সম্পর্কিত সবচেয়ে মৌলিক নীতি হলো, যেকোনো পরিস্থিতিতেই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে হবে:

> "যত সহজে যুদ্ধ জয় করা যায়, তত সহজে তা হারানোও সম্ভব। যুদ্ধ প্রকৃতিগতভাবে একটি অনিশ্চিত বিষয়, এবং এর সাথে সাথে যুদ্ধ একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। সুতরাং, যুদ্ধ থেকে বাঁচো। উপায় (Upaya) ব্যবহার করো, যুদ্ধ ছাড়া শত্রুর উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করো, শত্রুকে তোমার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পরাজিত করো, যখন সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন সামরিক শক্তি ব্যবহার করো।"

"উপায়" (Upaya) চারটি কৌশলকে বোঝায়:

---

[৮৬] মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২২ খ্রিস্টপূর্বে স্থাপন করেন। এর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা)। এই সাম্রাজ্যটি সম্রাট অশোকের (যাকে অশোকাও বলা হয়) সময়কালের মধ্যে (২৯৮ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। দক্ষিণ ভারতের শেষ অংশ বাদে সমগ্র উপমহাদেশে আশোক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অশোকের পঞ্চাশ বছর পর এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ১৮৫ খ্রিস্টপূর্বে এই সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

এক. সামা (Sama): অর্থাৎ আলোচনা, সমঝোতা বা চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ থামানো।

দুই. দানা (Dana): অর্থাৎ জরিমানা, ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সুবিধা দিয়ে যুদ্ধ থামানো।

তিন. ভেদা (Bheda): অর্থাৎ যুক্তি বা কৌশল ব্যবহার করে বিভ্রান্তি তৈরি করা। শত্রুর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং অমিল সৃষ্টি করা, যাতে তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে।

চার. ডান্ডা (Danda): অর্থাৎ যখন উপরের কৌশলগুলি ব্যর্থ হয়, তখন শক্তির ব্যবহার করা।

অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যদি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে যুদ্ধ জিততে জন্য সকল প্রকার কৌশল ব্যবহার করা উচিত, যার মধ্যে বাহিনীর সরাসরি লড়াই ছাড়াও, শত্রুর নেতৃত্বের গোপন হত্যাকাণ্ড, শত্রুর নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, সামরিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য শত্রুর বাহিনীতে গোপনে নিজের পুরুষ এবং নারীদের প্রবেশ করানো এবং নিজেদের সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করার পাশাপাশি শত্রুর সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য উৎসাহ এবং প্রচারমূলক কার্যক্রমের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত।

অর্থশাস্ত্রে গোয়েন্দাগিরির জন্য নারীদের ব্যবহারের উল্লেখও করা হয়েছে:

> "(শত্রুর) শাসক শ্রেণীকে দুর্বল করার জন্য, (শত্রুর) সরকারের পরামর্শক পরিষদের প্রধানদের সুন্দরী এবং তরুণী নারীদের মাধ্যমে মোহিত করতে হবে। যখন তাদের অনুভূতি গুলো জেগে ওঠে, তখন (এই নারীরা) একজনকে তার ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অন্যজনের কাছে যেতে হবে এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে হবে।"

অর্থশাস্ত্রে এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেহেতু শত্রুও তথ্য সংগ্রহ করতে এবং প্রচার চালাতে আমাদের অঞ্চলে গুপ্তচর পাঠায়, সেজন্য গোপন কার্যক্রমের জন্য ডাবল এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত এবং তাদের উপযুক্ত পুরস্কৃতও করা উচিত।

যেখানে অর্থশাস্ত্রে বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্য ছিল সরকারী কর্মকর্তাদের সততা পরীক্ষা করা, রাজনৈতিক দুষ্প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা, জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ রোধ করা এবং এমন শক্তিশালী ব্যক্তিদের নির্মূল করা, যারা প্রকাশ্যে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। গোয়েন্দাগিরি এবং বৈদেশিক নীতির এই নীতিগুলির কারণে "চাণক্য" শব্দটি ছলনা এবং প্রতারণার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

(1)

Vinayak Damodar Savarkar

১৯২৩ "হিন্দু জাতীয়তাবাদ" একটি রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

জন্ম: ১৮৮৩, ২৮ মে

১২ বছর বয়সে নিজ গ্রামে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় নেতৃত্ব দেন

১৯১০ সালে সাভারকারকে বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে থাকার অপরাধে এবং তার ভাই গণেশ সাভারকর-এর সশস্ত্র বিদ্রোহের সাথে যুক্তের অপরাধে গ্রেফতার করে — পালানোর চেষ্টা করলে কালাপানিতে স্থানান্তর করে →

⇒ ১৯১১ ৫০ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে কালাপানিতে নেয় —

⇒ ১৯১৩ সালে মুক্তির আবেদন করলে তা খারিজ হয়

⇒ ১৯১৭ - ॥ রাজি হয়নি

⇒ ১৯২০ আবারও আবেদন করে —

⇒ ১৯২১ সালে সাভারকারকে "রত্নগিরি কারাগারে" পাঠায়। এখানে "হিন্দুত্ব" বইটি লিখেন।

⇒ ১৯২৪ - এ ছাড়া পান শর্তসাপেক্ষে।

⇒ ১৯৩৭ - রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

= ১৯২৪ - এ সাভারকারের প্রকাশিত গ্রন্থে বলেন হিন্দু দেশে খ্রিস্টান বা মুসলমানদের স্থান নেই — হিন্দুরাষ্ট্র ছিল।

বই

[illegible]

১৯৩৭ → সাভারকারের রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শেষ হয় এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন

১৯৪৮ — গান্ধী হত্যা এবং সাভারকারকে গান্ধী হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করে।

১৯৪৯ — প্রমাণের অভাবে সাভারকারকে ছেড়ে দেয় আদালত এবং নাথুরাম গডসের ফাঁসি হয়

→ এরপর হিন্দুত্ববাদী বক্তৃতা দেয়া থেকে বিরত থাকার এবং রাজনীতি থেকে দূরে থাকার শর্তে ছাড়া পান

১৯৬৬, 2 February - আহার ও ঔষধ গ্রহণ বন্ধ করেন

২৬ - February মারা যান

২০১৩ সালে narendra modi ক্ষমতায় আসার পর — হিন্দু মহাসভার সভাপতিকে আহ্বান করে নাথুরাম গডসে কে জাতীয় নায়কের মর্যাদা দেয়া হয় —

(৭)

এম. এস গোলওয়ালকার

madhav sadashivrao golwalkar

জন্ম -

১৯০৬ - মহারাষ্ট্রের নাগপুরের - মারাঠি নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।

- ১৯২২ - তিনি নাগপুরের একটি মিশনারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হন এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিরোধী হন।

- ১৯২৪ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন

- ১৯৩৫ সালে প্রাণিবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন

- ১৯৩৪-এ ~~হেডগেওয়ার~~ হেডগেওয়ার নাগপুর শাখার - কার্যনির্বাহী (সেক্রেটারি) হিসেবে নিযুক্ত করেন। RSS-এ

- ১৯৩৬ সনে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যান, সন্ন্যাসী হোন। সেখানে স্বামী ~~১৯৩৭~~, অখণ্ড আনন্দ এর শিষ্য হন।

- ১৯৩৭-এ অখণ্ড আনন্দ-এর মৃত্যুর পর - আশ্রম ছেড়ে দেন। পুনরায় RSS-এ যোগ দেন - হেডগেওয়ার-এর প্রভাবে, হেডগেওয়ার তাকে All india অফিসার-প্রশিক্ষণ শিবিরের ইনচার্জ করেন ১৯৩৯ পর্যন্ত।

হেডগেওয়ার এর মৃত্যুর পর কিছু সময়ের জন্য, সহ-সম্পাদক ছিলেন,

১৯৪০ - ১৯৭৩ RSS-এর সরসংঘচালক ছিলেন

বই

- রাষ্ট্র মীমাংসা / We, or our nation hood Defined
- বইটিকে RSS-এর আদর্শের শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়।

১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার পর তিনি সহ ২০ হাজার কর্মী গ্রেপ্তার হন এবং RSS-এর উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

১৯৪৯-এ RSS এর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

হিন্দু মহাসভা

(৩)

→ এর প্রতিষ্ঠার পেছনে কারণ

(i) ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ
(ii) ১৯০৬ " মুসলিম লীগ
(iii) ১৯০৯ " ব্রিটিশ রাজের পক্ষ থেকে মর্লে-মিন্টো (morley minto reforms)-এর মাধ্যমে মুসলিম আসন বরাদ্দ হয়।

১৯১৫

-হরিদ্বারে একটি মেলায় "সর্বদেশক হিন্দু সভা" (Sarvadeshak Hindu Sabha) নামক একটি সংগঠন তৈরি করে।
-কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও আর্য সমাজের নেতা মুন্সীরাম (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) উপস্থিত ছিলেন, তারা সর্বদেশক হিন্দু সভা পূর্ণরূপে সমর্থন দেন।
-সভাপতিত্ব করেন মণীন্দ্র চন্দ্র ~~নাথ~~ নন্দী, তিনি ঘোষণা দেন যে, ব্রিটিশ রাজের প্রতি তাদের আনুগত্য রয়েছে।

যার কারণে

⇒ ১৯০৭-এ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এখানে, কংগ্রেস সহিংস এবং নরমপন্থী দুটি শিবিরে ভাগ হয়।

(i) নরমপন্থী শিবিরের নেতৃত্ব দেন Gopal krishna Gokhale
(ii) সহিংস শিবিরের নেতৃত্ব দেন Bal Gangdhar Tilak (বাল গঙ্গাধর তিলক)

→ তিলকের সাথে পাঞ্জাব থেকে লালা লাজপত রায় ও বঙ্গ থেকে বিপিন চন্দ্র পাল সক্রিয়ভাবে

১৯২১

-হিন্দু মহাসভা কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে যায়, এর আগে এটি কংগ্রেসের উপগোষ্ঠী ছিল, ১৯২০-এ দেশ বিভক্তির পর সেকুলার ও হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মতপার্থক্য দেখা দেয়।

Akhil Bhartiya Hindu mahasabha

ঠিক এর পরেই সংগঠনটি হিন্দু মহাসভা থেকে "অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা" রাখে।

⇒ এবার তারা সংগঠনটির সংবিধান থেকে ব্রিটিশ রাজের আনুগত্য সরিয়ে নেয় এবং যোগ করে হিন্দু জাতির আনুগত্য।

Quit india movement

-কংগ্রেস যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন করে, তখন হিন্দু মহাসভাও তার (কংগ্রেস)-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

ফলাফল

১৯০৯ সালে কংগ্রেস এই চরমপন্থীর সাথে সম্পর্কিত নেতা লালা লাজপত রায় এবং আর্য সমাজের সাথে সম্পর্কিত নেতা লাল চন্দ্র ও শাদি লাল পাঞ্জাব হিন্দু সভা প্রতিষ্ঠা করে। (উদ্দেশ্য হিন্দু স্বার্থ রক্ষার জন্য)

-মদন মোহন মালব্য ১৯১৫ october-এ প্রথম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন

১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের বিপরীতে হিন্দু মহাসভা ~~জোট করে~~ মুসলিম লীগের সাথে জোট করে। সিন্ধ, সীমান্ত ও বাংলা অঞ্চলের মুসলিমদের সাথে মিলে সরকার গঠন করে।

(৫)

RSS

১৯২৫-এ দশেরা উৎসবের সময় হেডগেওয়ার RSS প্রতিষ্ঠা করেন।

BJP (ভারতীয় জনতা পার্টি)

(১)

- এখানে পূর্বের ইতিহাস আলোচনা করি।
- ধাপে ধাপে
  - সংঘপরিবার
  - ↓
  - ভারতীয় জনসংঘ
  - ↓
  - জনতা পার্টি

১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা অবসানের পর কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে অন্যান্য দলের সাথে জোট গঠন করে এবং নতুন দল তৈরি, জনতা পার্টি বহাল করে
- প্রাক্তন সংঘ নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী - পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন
- লালকৃষ্ণ আদবানি - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হন।

১৯৭৮ - ১৯৭৯ - এ জনতা পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত জনসংঘ সদস্যরা আলীগড় ও জামশেদপুর সংগঠিত মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় অংশ নেয়। যা দলটির মধ্যে মতবিরোধ তৈরি করে। এরপর ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা বলে সংঘকে RSS থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। কিন্তু সংঘ তা প্রত্যাখ্যান করে। পরে ~~সংঘ~~ জনতা পার্টি ছেড়ে যায়।

(২)

১৯৮০-এর পর
- ভারতীয় সংঘের প্রাক্তন সদস্য সংঘপরিবারের মতাদর্শ এর মাধ্যমে একমত হয়ে BJP প্রতিষ্ঠা করেন।
- সভাপতি হন অটল বিহারী বাজপেয়ী।

১৯৮০ এর দশকে
- এই সময় মুসলিম দাঙ্গা বৃদ্ধি পায়

১৯৮৪ - এ ২টি আসন পায় মাত্র।
→ আদবানিকে উগ্রপন্থী অবস্থান - যার ফলে উগ্রবাদ - লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে আন্দোলন। তিনি বাবরি মসজিদের ওই স্থানের স্লোগান দেন

১৯৮৯
- এই নির্বাচনে ৮৫টি আসন লাভ করে BJP এবং জাতীয় Front নামে সংগঠিত জোটে অংশ নেয়, প্রধানমন্ত্রী ভি.পি. সিং -

১৯৯০-এ
- রথযাত্রা হয় আদবানি - দের সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত - রামমন্দির সমর্থনে;
- বিতর্কিত - ৬৪ পৃষ্ঠা -

পুনরায় নির্বাচনে ১২০টি আসন পায় -

১৯৯২

সংঘপরিবার - প্রায় ১ লক্ষ + (সাধু ও সন্ন্যাসী) একত্রিত হয়ে - বাবরি মসজিদ আক্রমণ করে,

১৯৯৬

BJP লোকসভায় ১৬১ আসন পায়
- অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হন।
- আস্থা ভোটে জিততে না পারার কারণে ১৩ দিনেই সরকার পড়ে যায়-
- আবার নির্বাচন হলে কোনো সরকার গঠিত হলেও বেশিদিন টিকেনি।

১৯৯৮

BJP নতুন জোট করে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) নির্বাচনে লড়েছে,
নির্বাচনে জয়ী হন অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৯৯

- এনডিএ জোটবদ্ধে, ৩০৩ আসন পায়
BJP পায় ১৮২ আসন, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হন।
- আদবানী উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন।
- এটি পাঁচ বছর স্থায়ী হয়।
→ উক্ত সরকারের সময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দাঙ্গায় ২০০০ মুসলমান মারা যায় ও প্রায় ১৫০০০০ মুসলমান বাড়িঘর ছেড়ে দেয়।

২০০৪

BJP নির্বাচনে হারে।

২০১৪

NDA = ~~২৮৬ টি~~ ৩৩৬ আসন পায়
BJP = একক ৩৩৬ এর মধ্যে ২৮৮ ছিল
total আসন ৫৪৩

২০১৯

পুনরায় নির্বাচিত। কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল

(৬)

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (Vishva Hindu Parishad)

১) ১৯৬৪ সালের ২৯ আগস্ট মুম্বাইয়ে সম্মেলনের আয়োজন করে RSS-এর প্রধান মা.স. গোলওয়ালকর, দাদাসাহেব আপ্তে স্বামী চিন্ময়ানন্দ কেশবরাম — সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উঁহারা।

২) হিন্দু সংগঠনের দর্শন অনুসারে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এবং স্থানীয় আদিবাসী গোষ্ঠীকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে মনে করা হয়।

৩) চিন্ময়ানন্দ স্বরস্বতীকে এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচন করা হয়। RSS-এর আপ্তে-কে এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নাম দেওয়া হয়।

৪) সংগঠনটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ১৯৬৬ ~~সালে~~ এলাহাবাদ কুম্ভমেলায় আন্তর্জাতিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল।

৫) 2021-December-এ হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত হওয়া ধর্ম সংসদে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও গণহত্যার ঘোষণা দেয়।

(৭)

বজরং দল (Bajrang Dal)

= ১৯৮৪-এ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

= বাবরি মসজিদ ধ্বংসে ১৯৯২ সালে সক্রিয় ছিল।

= 2002 সালের গুজরাট দাঙ্গায় মুসলিমদের হত্যায় জড়িত।

= ২০০৬-এ মালেগাঁও বোমা হামলা, ২০০৭- সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা হামলায় ও হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদ-এ বোমা হামলায় সম্পৃক্ত ছিল।

= ২০০৮ সালে বজরং দল কর্ণাটকে খ্রিস্টান নির্যাতন - ওড়িশায় খ্রিস্টানদের উপর হামলা করে।

= ২০১৫ সালে গোরক্ষা আন্দোলনের নামে অনেক মুসলমান হত্যা করে।

Durga Vahini

= ১৯৯১ - রামজন্মভূমি আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

= গুজরাটের দাঙ্গায় জড়িত ছিল।

= ২০২২ সালে হিজাব পরিহিত মুসলিম নারী হেনস্তা সহ বিভিন্ন কাজে Bajrang dal কে সহায়তা করেছে।

৮

Akhil Bharatiya Vidyarthi
-অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ

RSS -এর ছাত্রসংগঠন

- ১৯৪৮ সালে RSS -এর কর্মী বলরাজ মাধোক এর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, হিন্দুত্ববাদ বাড়াতে
- (কাশ্মীর-এর প্রসঙ্গে)
- -ভারতীয় সমাজের issue তোলার জন্য
-

-মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ-

National Front of muslim

RSS -এর মতাদর্শকে মুসলিম সমাজে বিস্তারের -একটি সংগঠিত দল-

- ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রবীণ RSS সদস্য জাতীয় কার্যকরী- মোহাম্মদ আফজাল এবং প্রচারক ইন্দ্রেশ কুমার কে যুক্ত করে-
- ২০০৯ সালে নির্বাচনে হিন্দু বন্দেমাতরম-এর বিরোধীদের সাথে মৈত্রী RSS-এর সাথে মিলে গিয়েছিল-

Abhinav Bharat
অভিনব ভারত

(সর্বভারতীয়) শিখ সংগঠন ৭১ এর

Nation Sikh Association
জাতীয় শিখসংগঠন

Shivsena
১৯৬৬ প্রতিষ্ঠিত

Maharashtra Navnirman Sena
মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা

শিরোমণি অকালি দল
Shiromoni Akali Dal

১৯৮৬, 28 November
প্রতিষ্ঠিত

Hindu Vivek Kendra

Vivekananda International Foundation
(বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশন)
— প্রতিষ্ঠা- ১৯৭২